॥ দ্বি তী য় অ ধ্যা য় ॥

মধুসূদন-সাহিত্যের সাধারণ বিবরণ : রূপ ও রীতি

মধুসূদন সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা এই যে তিনি বিশেষ ভাবেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য যেমন হোমার মিল্টনের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাঁর নাটকও তেমনি সেক্সপীয়রের নাট্যকলার আদর্শে নির্মিত। তাঁর বীরাঙ্গনা ওভিডের পত্রকাব্য দ্বারা অনুপ্রেরিত, আর চতুর্দশপদী কবিতা তো ইংরেজি এবং ইটালীয় সনেটেরই অনুকরণ।

মধুসূদনে পাশ্চাত্যপ্রভাব যেমন একদিক দিয়ে সত্য তেমনি প্রাচ্য প্রভাবও অন্য দিক দিয়ে সত্য। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রায় সবই রামায়ণ মহাভারত পুরাণ থেকে সংগৃহীত। মধুসূদনের কাব্যবিচার প্রসঙ্গে এই দুই দিকের যথার্থ বিশ্লেষণ দরকার। আঙ্গিকের মৌলিক ধারণায় তিনি পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট ঋণী হলেও বস্তুকেন্দ্রিক চরিত্র পরিকল্পনায় ও রসসন্নিবেশে তিনি যে ভারতীয় কাব্য পুরাণের ধারা নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই দুই দিকের হিসাবের দ্বারাই মধুসূদনের কাব্যের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা সম্ভব। তথাপি বর্তমান আলোচনায় আমরা প্রাচ্য প্রভাবের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ সন্ধান করছি। কিন্তু দুইয়ের যোগ অপেক্ষা বলেই আলোচনাসূত্রে ইউরোপীয় প্রভাবেরও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আবশ্যক।

মধুসূদন দীর্ঘায়ু হন নি; আর বাল্যাবস্থায় কিছু ইংরেজি রচনা ও মাদ্রাজ বাসকালে জীবিকার জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু ইংরেজি রচনা বাদ দিলে তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাতও হয় যথেষ্ট বিলম্বে - পরিণত বয়সে। খুব অল্প সময়ই তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য সাধনার জন্য। বিলাত গমনের সঙ্গেই সে সাধনারও প্রায় অবসান। প্রকৃতপক্ষে মাত্র চারটি বৎসর তাঁর সৃষ্টিশীলতার কাল। তবু তাঁর রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। তিনি বাংলাতে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী,

কৃষ্ণকুমারী ও মায়াকানন এই চারখানি নাটক ; বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ এবং একেই কি বলে সভ্যতা এই দুখানি প্রহসন ; তিলোত্তমাসম্ভব , মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা কাহিনী কাব্য ; বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাবানুসরণে ব্রজাঙ্গনা অর্থাৎ ব্রজবিরহ জাতীয় ব্রজাঙ্গনা কাব্য ; চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং ইলিয়াড মহাকাব্যের (দ্বাদশ সর্গের মধ্যভাগ পর্যন্ত)অসমাপ্ত গদ্যানুবাদ হেক্টর বধ রচনা করেন । এছাড়া আছে পাঁচটি অসমাপ্ত বীরাঙ্গনা-পত্রিকা , দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর , সুভদ্রা হরণ , দুর্যোধনের মৃত্যু , পঞ্চাবতী , রিজিয়া প্রভৃতি অসমাপ্ত কাব্যাংশ এবং নীতি ও বিবিধ বিষয়ক কিছু খণ্ড কবিতা । ইংরাজিতে কিছু প্রবন্ধ ও খণ্ড কবিতা ছাড়াও আছে মাদ্রাজে লেখা Vision of the Past, Captive Lady, রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজি অনুবাদ, Rizia Empress of India, দুর্নিরীত শর্মিষ্ঠার অনুবাদ এবং পত্রাদি পত্র ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর প্রধান মৌলিক রচনা গুলির বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশীয় পুরাণ মহাকাব্য থেকে সংগৃহীত । মধুসূদন অধ্যয়নশীল ব্যক্তি ছিলেন , বহুভাষা তিনি অধিগত করেছেন , কলেজের সারস্বত বর্ষের পুনর্গঠনায় একদিকে যেমন পাশ্চাত্য গ্রীক ল্যাটিন পুরাণ আর প্রাচ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করেছেন অন্যদিকে তেমনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন কাব্যাদর্শের টানে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছেন । কেবল গ্রহণ করা নয় , পরিপাক করার শক্তিও তাঁর ছিল অসাধারণ । তাই দেশি বিদেশি আদর্শকে আত্মসাৎ করে নিয়ে তিনি হলেন আধুনিক বাংলার প্রথম কবি ।

ভাবাদর্শ এবং উপস্থাপনার দিক থেকে পাশ্চাত্যের অনুসরণ সুস্পষ্ট হলেও কাহিনী বিষয়ে তিনি দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যের উপরেই নির্ভর করেছেন । তাঁর প্রথম বাংলা রচনা শর্মিষ্ঠার বিষয়বস্তু যে মহাভারত থেকে গৃহীত সেটা তাৎপর্যহীন নয় । চির-সহচর কৃত্তিবাস কাশীরাম থেকেই তিনি বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন সবচেয়ে বেশি । ব্যাস বাল্মীকির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল , তাঁদের আক্ষরিক অনুসরণের বহু নিদর্শনও আছে , তবু যেখানে এঁদের সঙ্গে কাশীরাম কৃত্তিবাসের পার্থক্য, সেখানে অনেকসময়েই তিনি বাঙালী কবিদেরই অনুসরণ করেছেন । শর্মিষ্ঠার কাহিনীতে সংস্কৃত

ও বাংলা মহাভারতে বিশেষ পার্থক্য নেই ; মূল কাহিনীকে তিনি কতটা গ্রহণ করেছেন বা প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন করেছেন সে বিষয়ে আমরা নাটকটির বিস্তারিত আলোচনায় (৪র্থ অধ্যায়) উল্লেখ করেছি । এই নাটকেই প্রথম পাশ্চাত্ত্য আদর্শের Scene বা গর্ভাঙ্ক বিভক্ত পঞ্চ অঙ্ক ব্যবহৃত হ'ল এবং সংস্কৃত নাট্যকলার কিছু প্রয়োগগত রীতি বর্জিত হ'ল । তবু যে মধুসূদন প্রথম প্রয়োজন বা সংস্কারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পুরোপুরি ইংরেজি নাটকের পদানুসরণ করেন নি তাও সত্য । একদিকে যেমন রয়েছে সংস্কৃত কবির বাক্যরীতি অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের ভাবসাদৃশ্য । ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শকে সম্পূর্ণতঃ অনুসরণ করেছেন এ নাটকে । সেজন্য পরিপূর্ণ শিল্পসিদ্ধি অর্জন সম্ভব হয় নি , যদ্যপি উপাদান অবলম্বনে যে নাটকীয়তা প্রকাশের অবকাশ ছিল, তার সদ্ব্যবহার সর্বাংশে ঘটে নি ।

পরবর্তী নাটক পদ্মাবতীতে গ্রীক পুরাণের Apple of Discord এর কাহিনীকে উপজীব্য করা সত্ত্বেও তার একটি ভারতীয় পৌরাণিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি । তাঁর নিজের মতে It is also written on the classical model.[১] প্রথম অঙ্কের পর থেকে কাহিনী সম্পূর্ণভাবেই কল্পিত এবং সংলাপে , উপসংহারে, উপস্থাপনায়, গঠন কৌশলে ও অলংকরণে স্পষ্টতঃই পাশ্চাত্যাদর্শের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায় ।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাট্যরচনার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । অভিনয়োপযোগিতা , নটনটীদের যোগ্যতা, দর্শককুলের রুচি ইত্যাদিকে অস্বীকার করে কোন নাট্যরচনাই সফলতা অর্জন করতে পারে না । মধুসূদনকেও এসব প্রবৃত্তির অবস্থায় নিজের কল্পনাকে সংযত করতে হয়েছিল , প্রতিভাকে নাটক রচনাও খণ্ডিত রাখতে হয়েছিল । যে নটনটীরা রত্নাবলীর অভিনয় করত, তাদের দ্বারাই শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতীও অভিনীত হবে জানতেন বলে তাঁকে তদুপযোগী করেই কাহিনী সংলাপ বা চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে ।

তাছাড়া এ নাটকে গ্রীক অদৃষ্টবাদের সঙ্গে ভারতীয় কর্মফলবাদের সংমিশ্রণ

---

১. ৫৫নং পত্র

ঘটতে দেখি। পদ্মাবতীর চরিত্রের সারল্য ও সর্বগুণ সত্ত্বেও বিনা অপরাধে তার জীবনে যে দুঃখের অভিঘাত ঘটল তার পিছনে গ্রীক নিয়তিই দায়ী, অথচ পরে তাকে শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা প্রতিপন্ন করে মঙ্গলকাব্যের মত কর্মফলবাদকেই স্বীকার করা হ'ল। যোগারের ছদ্মবেশে ইন্দ্রনীলের প্রলোভন-দৃশ্য দিয়ে যে কাহিনীর আরম্ভ, তার পরিসমাপ্তি ঘটল ভবানীর অনুগ্রহে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলন দৃশ্যে। নাট্যকার যে সম্ভাবনা কাহিনীর প্রারম্ভে প্রাণ করে দিয়েছিল — ভারতীয় পৌরাণিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টায় তা কেবল গল্প সর্বস্ব হয়েই রইল।

কৃষ্ণকুমারী রচনায় মধুসূদন কিছুটা দুঃসাহস দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক কাহিনীকে ইতিপূর্বে নাটকের উপজীব্য করা হয় নি। সুদূর অতীতে কাহিনী স্থাপনা করায় একদিকে যেমন কল্পনার পক্ষবিস্তারের অবকাশ মেলে, অন্য দিকে ইতিহাসের সেই অতীত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর অবতারণায় দেশপ্রেমচেতনাও কিছুটা পরিতৃপ্তি লাভ করে। এমনই একটি কাহিনীর জন্য বহু অনুসন্ধানের পর তিনি টডের রাজস্থানে তা খুঁজে পেলেন। এর বিয়োগান্তক উপসংহার তো ভারতীয় আদর্শের বিরোধী। শর্মিষ্ঠা বা পদ্মাবতীর কাহিনীর মধ্যেও সংঘর্ষকে তীব্র করে তুলে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও মধুসূদন সচেতন ভাবেই সে পথ পরিহার করে নাটককে কবিসুলভ দৃশ্যকাব্যই করে রেখেছেন। কৃষ্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্তক নাটক, যদিও নিয়তি-নির্দিষ্ট নায়ক ভীমসিংহের পরিণতি ভীতি মিশ্রিত করুণার উদ্রেক করতে পারেনি, তার নিশ্চিন্ত হাহাকার এবং কৃষ্ণকুমারী ও রাণীর মৃত্যুতে নাটক অনেকটা মেলোড্রামায় পরিণত হয়েছে। King Lear-এর মত ভীমসিংহ বেদনার প্রত্যাঘাতে মানসিক সাম্য হারালেও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির সেই বিরাট শক্তির অপচয়-জনিত বিস্মিত বেদনা দর্শকের মনকে ভারাক্রান্ত করে না। তবু এ নাটকে যে তিনি কাহিনী-পরিকল্পনা ও প্রকৃত নাট্যরচনা-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সংস্কৃত নাট্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে নূতন নাটক তিনি রচনা করলেন তা বেলগাছিয়ার রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে

পারে নি — এ নাটকের অভিনয় হয় নি । নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের সাফল্য সম্পর্কে রাজা যতীন্দ্র মোহনের মনে সংশয় ছিল বলে মধুসূদন নিজের প্রেরণা বা কবিত্বের দাবীকে উপেক্ষা করে অভিনয়ের সুবিধার জন্য গদ্যেই নাটকটি রচনা করেছিলেন, তবু, দুর্ভাগ্য নাটক বলেই তা অভিনীত হল না । নাটক সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকের পার্থক্য , দেশীয় জনমানসের বিশিষ্ট প্রবণতা, নাটকের ভাষা, নাটকে কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ কতখানি — ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ভাবনার স্বাক্ষর তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে । তিনি আশা রাখতেন নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি বিপুল জনপ্রিয় হবেন । কিন্তু রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকদের উদাসীনতার ফলে সে সুযোগ তিনি পেলেন না ।

ইতিপূর্বে সমসাময়িক সমাজ পারিপার্শ্বিক বিষয় অবলম্বনে মধুসূদন দুখানি প্রহসন রচনা করেছিলেন, কিন্তু কিছু লোকের বিরোধিতায় অথবা অপ্রীতিভাজন হবার আশঙ্কায় রাজারা সেই প্রহসন দুটির অভিনয় করান নি । যদিও 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' উৎকৃষ্ট প্রহসন হিসাবে রামগতি ন্যায়রত্ন ("বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"-এ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ([illegible] লাইব্রেরীর বক্তৃতায়) প্রভৃতির স্বীকৃতি লাভ করেছিল , তবু এ রকমের প্রাত্যহিকতা-লাঞ্ছিত রচনায় কবির নিজের মনেরই সায় ছিল না । এ সম্পর্কে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন —

As a scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces, but to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces.[১]

---

১. ৫৬নং পত্র

পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তৎকালে যে স্বদেশ চেতনার উদ্বোধন ঘটেছিল তারই ফলে দেশীয় সমাজ সংস্কারের প্রবর্তনা দেখা দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নক্শা প্রহসন রচনার প্রাচুর্যের কারণ সেটাই এবং এই মনই প্রহসন রচনার পিছনেও কাজ করেছে। তবু তাঁর মানস প্রবণতা উচিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি অথবা প্রত্যক্ষ বিবৃতির অনুকূল ছিল না, উদার বিশাল কল্পনা এবং সৌন্দর্যলোকে পরিভ্রমণেই তিনি তৃপ্তিবোধ করতেন; জীবনের মর্মমূলেই যে গভীর বেদনা আর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার হাহাকার, তারই বাণীরূপ সৃষ্টিতে তাঁর পরিতৃপ্তি। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক আর শ্রেষ্ঠ কাব্য দুখানিই তাই ট্র্যাজেডি।

মধুসূদনের একদিকে যেমন গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল অন্যদিকে সেক্সপীয়রের নাটকও তাঁর ভাণ্ডারে পড়া ছিল। কৃষ্ণকুমারীতে [illegible]–এর সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তবু এর ট্র্যাজেডি গ্রীকদের মত নয়। সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির পরিণামের জন্য দায়ী মানুষ নিজেই। তার চরিত্রে রয়, মনুষ্যের মধ্যে দুর্বলতার বীজও থাকে; মনদেহে কলির প্রবেশের মত সেই ছিদ্রপথেই ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে ওঠে। আর গ্রীক ট্র্যাজেডির কারণ অন্ধ অমোঘ নিয়তি; নর অথবা দেবতা কারোরই মুক্তি নেই সেই নিয়তির হাত থেকে। কৃষ্ণকুমারী নাটকে প্লট গঠন কলাকৌশল এবং চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর প্রথম নাটক দুটিতে কবিত্ব কিছু বেশি প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন, তাই এ নাটকে অপ্রধান অলঙ্কৃত ভঙ্গী এবং সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাস বক্তৃতা বর্জন করে শৈল্পিক আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তিনি। ইউরোপীয় নাটক ও দেশীয় নাটকের প্রকৃতিগত পার্থক্য মনে রেখেও[৩] জাতীয় প্রকৃতির সাথে সংগতি রক্ষা করেই তিনি এই নাটক রচনা করতে চেষ্টা করেছেন।

তবু স্বীকার করতেই হবে ট্র্যাজেডি সৃষ্টিতে একমুখিতা রক্ষা হয় নি। কৃষ্ণকুমারীকে ঘিরে সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে, কিন্তু তাতে তার তেমন হাত নেই। তার মৃত্যুতেই নাটকের করুণ পরিসমাপ্তি, তাই তারই নামে নাটকটির নামকরণ হয়েছে,

---

৩. কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লেখা ৮০নং পত্র।

কিন্তু এমন ট্র্যাজেডি ভীমসিংহের। পিতার আদেশেই যদি কৃষ্ণার হত্যা সংঘটিত হত তবে এটি অপরিহার্য অদৃষ্টবাদের নাটক হয়ে উঠতে পারত ; কিন্তু দেখা গেল কৃষ্ণা স্বহস্তে প্রাণ বিসর্জন দিল। এখানে গ্রীক আদর্শের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় আত্মোৎসর্গের মিশ্রণ ঘটল। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের হত্যা নায়ক রাবণের ট্র্যাজেডিই ফুটিয়ে তুলেছে, কিন্তু রাবণ প্রথমাবধি ভীমসিংহের মত এমন নিষ্ক্রিয় নয়। বীরবাহুর মৃত্যুতে যে রাবণ একবার নিরাশতা পরিহারে প্রস্তুত হয়েছিল, মেঘনাদের মৃত্যু 'প্রতি-বিধিৎসিতে' সেই রাবণ রণস্থলে রণক্ষেত্রে যাত্রা করে পুত্রহন্তারক লক্ষ্মণকে শক্তিশেল-হত করেছে। সেই লক্ষ্মণ যখন পুনর্জীবন লাভ করল তখনই রাবণের ট্র্যাজেডি চরম পর্যায়ে উপনীত হল। ভীমসিংহকে নাটকে প্রথমাবধি দুর্বলরূপেই পাই, পরিস্থিতিকে অতিক্রম করবার জন্য একবারও তাকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে দেখি না। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ভীমসিংহ উদয়পুরের পূর্ব-সমৃদ্ধি ও বর্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করেছে কিন্তু হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে কখনও উদ্যোগ করেনি। মিল্টনের শয়তানের আদর্শ "To be weak is miserable, doing or suffering" - রাবণের জীবনের মূলমন্ত্র হলেও ভীমসিংহের ক্ষেত্রে কখনই নয়। তাই দুই কাহিনীতেই সন্তানের মৃত্যুতে পিতার হাহাকার ও আর্তনাদ বেদনা ফুটিয়ে তুললেও কৃষ্ণকুমারী প্রকৃত ট্র্যাজেডি না হয়ে কেবল করুণ রসাত্মক হয়ে রইল। তবু এই নাটকে গ্রীক ও খ্রীষ্টান আদর্শের মিশ্রণ এবং দেশের জাতীয় জাতি-প্রকৃতির সঙ্গে সংগতি রক্ষার প্রচেষ্টায় মধুসূদনের গভীর অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর পরিকল্পনা ছিল আরও কয়েকখানি নাটক রচনা করবেন - সে সুযোগ পেলে এই ত্রুটিগুলি সংশোধন হতে পারত কিন্তু কৃষ্ণকুমারী অভিনয় না হওয়ায় তার মন ভেঙে যায়। (উল্লেখ্য যে ছয় বৎসর পরে শোভাবাজার রঙ্গমঞ্চে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল।) কৃষ্ণকুমারী রচনার সমকালে কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লেখা পত্রগুলিতে দেখা যায় দর্শককুলের কথা ভেবে তিনি নিজের রচনাকে কত পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে সুভদ্রাহরণ বিষয়ক নাটক, মুসলমানী কাহিনী নিয়ে রিজিয়া নাটক রচনার পরিকল্পনাও বর্জন করতে হয়েছিল। অথচ মুসলমানী

কাহিনীতে নাটকীয় আবেগ ও তীব্রতা ফুটিয়ে তোলার সুযোগ বেশি বলেই তাঁর প্রস্তাব ছিল।

We ought to take up Indo-Musselman subjects. The Mohamedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the desplay of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.[৪] এমন প্রসঙ্গ বিস্তারিত উল্লেখের কারণ এই যে নাটকরচনায় তিনি পাশ্চাত্য আদর্শকেই নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজের অনুকূল্য লাভ না করায় তা সম্ভব হয় নি।

Mind you, you all broke my wings once about the Persee ! If you play a similar trick this time (কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে বলা), I shall forswear Bengali and write books in Hibrew and Chinese.[৫]

প্রকৃত পক্ষেই তাঁকে নাটক লেখা বন্ধ করতে হল। তাঁর আক্ষেপ — Alas ! born an age too soon. সত্য হল, ইতিহাসের কাছে তিনি এই উদ্যোক্তাদের দায়ী করে গেলেন — How will you answer at the bar of Postirity.[৬]

নাটকের যে বাধা ছিল কাব্যে তা না থাকায় সেখানে মধুসূদনের সুধীম কবিচিত্ত বৃহত্তর সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে। তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব কেবল বন্ধমুক্ত ছন্দসংগীতের উল্লাস নয়, এক সর্বব্যাপী সৌন্দর্য চেতনার প্রথম রূপ বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক। ব্যক্তি চরিত্রে মধুসূদন খেয়ালী ছিলেন, সেই খেয়ালের ঝোঁকেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্য রচনা করেছিলেন ঠিকই তবু

---

৪. ৮৪নং পত্র

৫. ৮৫নং পত্র

৬. ৮৬নং পত্র

এর পিছনে দীর্ঘকালের মানস প্রস্তুতি অবশ্যই ছিল। মিলটনের কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসীম শ্রদ্ধা –

I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though[৭] glorious, still they are mortal poets! Milton is divine.

Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His[৮] is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

এর থেকে বোঝা যায় মিলটন সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল এবং সেই blank verse এর মধুর কল্লোলধ্বনি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য বহুদিন ধরেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কেবল পয়ারের মিল এবং সুনির্দিষ্ট যতি থেকেই মুক্তি নয় iambic pentameter – কে অবলম্বন করেও মিলটন যেমন সংগীত প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, মধুসূদনও বাংলা মিশ্রকলাবৃত্তের চতুর্মাত্রক পর্ব ও পয়ার পংক্তি-র চোদ্দমাত্রার দৈর্ঘ্য বজায় রেখেই এবং বাংলা ভাষাপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে একটি গীতপ্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। পয়ারের আট ছয়ের চাল বজায় রাখল না, এমন কি বহুক্ষেত্রে তিন, পাঁচ, ছয় সাত যে কোন সংখ্যক মাত্রার পরেও ভাবযতি স্থাপিত হ'ল। তবু পয়ার-লক্ষণ ব্যাহত না করেই পংক্তি-

---

৭. ৬৫নং পত্র

৮. ৬১নং পত্র

থেকে পংক্তিতে ভাব প্রবাহিত হয়ে চলল। তাঁর নিজের ভাষাতেই অমিত্রাক্ষরের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি অনুধাবন করা যায় —

ক) Good Blank verse should be sonorous and the best writer of Blank verse in English is the toughest of poets.[৯]

খ) So many fellows have of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd 3rd, 4th, 5th, 7th, 9th, 10th, 11th, and 12th.[১০]

গ) এই ছন্দের পদবিভাজন রক্ষিত না হলেও অষ্টম মাত্রা টেনে পড়লে মাধুর্য বৃদ্ধি হয় বলে তিনি মনে করতেন। ... the 8th should be a long foot ... the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. বলা বাহুল্য foot এবং syllable এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত।

ধ্বনির এই প্রবহমানতা ছাড়াও দুই মিলিত পংক্তির শ্লোক লক্ষণ অস্বীকার করে ভাবানুযায়ী পংক্তি-পুঞ্জ (verse paragraph) সৃষ্টি করে তিনি বাংলা পদ্যে আশ্চর্য গাম্ভীর্য ও সংগীত প্রবাহ সঞ্চারিত করলেন। তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশের পরে যে সমালোচনা হয়েছিল, তার অধিকাংশই এর ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে। রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে পত্রে — If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem — লিখে এই

---

৯. ৫৬ নং পত্র

১০. ৬৩নং পত্র

১১. ৭১নং পত্র

কাব্যের ভাষা ও ছন্দের দৈবী ঐশ্বর্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন অবশ্য তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এ একে মিষ্টতাহীন ও কর্কশ বলেছিলেন। বিদ্যাসাগরও প্রথমে এ ছন্দের মহিমা অনুধাবন করতে পারেন নি — অনভ্যাস ও অপরিচয়ই তার কারণ।[১২] ক্রমশ পাঠকেরা এ ছন্দে অভ্যস্ত হয় — blank verse is the 'go' now ।[১২] তিলোত্তমার পরে মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনায় কবি এ ছন্দ ব্যবহারে চরম সিদ্ধি অর্জন করেন।

ভাবের দিক দিয়ে তিলোত্তমাসম্ভব অভিনব। এর কাহিনী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। মহাভারতে সুন্দ উপসুন্দের স্বর্গরাজ্য জয় এবং ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন তাদের পতন অসম্ভব বলে তিলোত্তমার সৃষ্টি ও দেবতাদের স্বর্গ পুনরুদ্ধারের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য। এ কাব্যরচনা কালে ছন্দ চিন্তা ও শব্দচিত্র রচনায় কবি এমনই মগ্ন ছিলেন যে কাহিনীর দিক দিয়ে তাঁর কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তৃতীয় সর্গে তিলোত্তমা-সৃষ্টির পরেই কাব্য শেষ করে দেবার কথা ভেবেছেন; যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে চতুর্থ সর্গ রচনা করলেন। আবার পরে রাজনারায়ণকে লিখেছেন — ... it was once my intention to have added another book to place them more conspicuously before the reader.[১৩] তা যে তিনি করেন নি সেটা কাব্যগত নয়, নিতান্ত বাইরের কারণ বিবেচনা করে যতীন্দ্রমোহন এই কাব্য ছাপাবার খরচ দেবেন বলেছিলেন, তাঁর ব্যয় বৃদ্ধি করতে চান নি কবি।

প্রকৃতপক্ষে কাহিনীগত কোন পরিকল্পনাই এসময়ে কবির মনে ছিল না। এ কারণেই তিলোত্তমাসম্ভবের কোন চরিত্রও তেমন পরিস্ফুট হয় নি, কবিমনের রসানুভূতিও দ্বিধা বিভক্ত। ইন্দ্রকে নায়ক করে তিনি কাহিনী আরম্ভ করলেন — যে ইন্দ্র cannot resist fate । অথচ কবি-মনের ঐশ্বর্য-বাসনা ও বলিষ্ঠ ভোগবাদী

---

১২. দ্রষ্টব্য ৬০নং পত্র।

১৩. ৬০নং পত্র

মানবত্বের প্রতি আকর্ষণের ফলে ইন্দ্রপত্নী দৈত্যভ্রাতাদ্বয়ের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ধাবিত হয়েছে। ফলে দৈত্য চরিত্র যেমন প্রস্ফুট হয়ে গেছে তেমনি ইন্দ্র চরিত্রও নির্জীব হয়েছে। বরং অন্য দেবতাদের এক একটি দিক দু'একটি রেখাসম্পাতে উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আসলে এ সময়ে কবি কাহিনী নিয়ে তেমন ভাবিতই ছিলেন না, কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কোন যুক্তিনিষ্ঠ প্লান বা কাব্যগত পরিকল্পনাও নেই। Gods and Titans -এর কাহিনী বলেই এতে human interest কম আছে একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন; অথচ মেঘনাদবধ রচনার সময়ে রাবণ চরিত্রের মধ্য দিয়েই তো তাঁর প্রাধান্য মানবিকতা ধরা পড়েছে। রাজা রাবণের ট্র্যাজেডিতে কবি মধুসূদনেরই বাসনা ও ব্যর্থতার হাহাকার প্রতিফলিত।

প্রথমে তিলোত্তমাসম্ভবে কেবল ছন্দের অভ্যাস আছে, সর্গগুলির মধ্যে কাহিনীর ক্রমপরিণতি বা চরিত্রের পূর্ণায়ন ঘটেনি, নব ছন্দ আবিষ্কারের উল্লাসে কেবল রূপ-সৌন্দর্যের রূপচিত্র রচনা হয়েছে। বাণভট্টের কাদম্বরীর সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

"সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণ লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে, বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন — এজন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নয় তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলি যে সুসংলগ্ন ধারাবাহিক তাহা নহে, এক একটি ছবির চারিদিকে প্রচুর কারুকার্য-বিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া — ফ্রেমসমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য-আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য।"[১৪]

এই সমালোচনা তিলোত্তমা সম্ভব সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য।

এই কাব্যকে মহাকাব্য বলা চলে কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে। মহাকাব্যের কাহিনীতে যে বিস্তার থাকে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্যাপী ঘটনাস্থলের যে ব্যাপ্তি থাকে, অথবা

---

১৪. প্রাচীন সাহিত্য, কাদম্বরী চিত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৬২ (৩৬)।

চরিত্র সৃষ্টিতে যে আদর্শ বা পূর্ণতা থাকে — তার কোনটিই তিলোত্তমাসম্ভবে পাই না । আধ্যাত্মিকার দৈন্য ও বর্ণনার বাহুল্যে এ কাব্যের চরিত্র সৃষ্টিও ব্যাহত হয়েছে । দেবতা বা দানব কারও চরিত্রই পরিপূর্ণতা লাভ করেনি , আর তিলোত্তমা তো ছায়ামাত্র । কেবল বর্ণনার দিকেই কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার জন্য । তবু এই বর্ণনার মধ্যে কবির মহাকাব্যিক শক্তির পরিচয়ও আছে । কাব্যের আরম্ভেই ভীষণ-দর্শন ধবলগিরির যে চিত্র আছে তাতেই তাঁর বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । স্মরণীয় যে তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠাতেও প্রথমেই ঊর্দ্ধশির হিমালয় ও তদুপরি অমরাবতী পুরীর উল্লেখ । ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আর নাটকে রামনারায়ণের নাট্য সমাচ্ছন্ন বঙ্গ সাহিত্য-প্রান্তরে প্রথম মধুসূদনই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ নিয়ে এলেন । প্রাংশু উত্তুঙ্গ , অভ্রভেদী শুভ্রবেশী পর্বতকে যোগী মহাদেবের সঙ্গে তুলিত করে কাব্যারম্ভেই পাঠক-মনকে তিনি দৈনন্দিন তুচ্ছতা থেকে মুক্তি দিলেন । অতঃপর ধবলগিরিতে বসন্তোদয় , ইন্দ্রাণীর ব্রহ্মলোক যাত্রাপথে সূর্যলোক চন্দ্রলোক 'গ্রহমণ্ডলী' রজত কনকদ্বীপ মধুর সংবরে' অতিক্রমের বর্ণনায় মহাকাব্যিক বিস্তার লক্ষ্য করা যায় । তিলোত্তমা-সৃষ্টিতে কবিমন বহুবিচিত্র বস্তুতে সৌন্দর্য সন্ধানে পরিভ্রমণরত ; আর শেষ সর্গে সমাপনান্তে তিলোত্তমার সূর্যলোক প্রয়াণ — সবই মহাকাব্যিক মহিমায় ভূষিত । বর্ণনার এই প্রাচুর্য ও বর্ণনৈপুণ্যের ফলে একে মহাকাব্যগোত্রীয় বলা অন্যায় নয় ।

বক্তব্য বিষয়ে যে মহাকাব্যের বিশালতা বা বিস্তৃতি এ কাব্যে নেই সে সম্পর্কে কবি নিজেও অবহিত ছিলেন ।

You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular 'Heroic Poem' I never meant it as such. It is a a story, a tale rather heroically told.[১৫]

এবং এই ভাবকল্পনাকে ধারণের ভাষা ও ছন্দও যে গম্ভীর হওয়া দরকার তা তিনি জানতেন ।

---

১৫. ৬০নং পত্র

I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the 'barren rascals' that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) inspiration.[১৩]

এই কাব্যের ভাষায় কোথায় কতটা সংস্কৃতের অথবা বিদেশী সাহিত্যের অনুসরণ আছে সে আলোচনার স্থান এটা নয়। কিন্তু ভারতীয় যে মহাভারতেরই কাহিনী নিয়ে যে কাব্য রচিত, তার অন্তরে আছে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবধারা। বাংলা সাহিত্যে এখানেই সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যতিরিক্ত নিছক সৌন্দর্য চেতনার কাব্য। তিলোত্তমা-দেহ গঠনে যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় তাদের বস্তুভার বিবর্জিত সৌন্দর্যসার দান করেছিল। বস্তুভারহীন নিরবয়ব সৌন্দর্যসারের প্রতীক তিলোত্তমা। কার্য সাধনের পরে তার জ্যোতির্লোকে গমন সেদিক দিয়ে সার্থক। কিন্তু সেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীককে দৈত্যেরা ভোগবাসনার বস্তু করতে চেয়েছিল বলেই তাদের ঘটল পতন। এই abstract এবং absolute সৌন্দর্য কল্পনা — যার সার্থকতম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের লিরিকে — বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনই তা প্রথম আনলেন। সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি মধুসূদনের এই প্রথম কাব্যটিতে একদিকে কীটসের অন্যদিকে কালিদাসের সৌন্দর্যতত্ত্ব বিধৃত। কালিদাস যেমন সামগ্রিক ভাবে না দেখে প্রতি ক্ষুদ্র খণ্ড বস্তুর চিত্র রচনা করেন (কুমারসম্ভবের হিমালয় বর্ণনা দ্রষ্টব্য), মধুসূদনও এ কাব্যে তেমনি খণ্ডচিত্র রচনা করেছেন। আর কীটস্ তাঁর প্রথম কাব্য Endymion — এর প্রথম পংক্তিতেই উচ্চারণ করেছিলেন — A thing of beauty is a joy for ever। এই আনন্দই সৌন্দর্যের সর্বপ্রথম আর সর্বশেষ সিদ্ধি। তিলোত্তমাতে মধুসূদন এই সৌন্দর্যসৃষ্টির আনন্দ উল্লাসেই মগ্ন।

---

১৩. ৫৬নং পত্র

"Endymonion – এর শত সহস্র দোষ সত্ত্বেও উহা কেবল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের বস্তুনিষ্ঠ অথচ ভাবগত অনুভূতি, সম্ভোগ এবং স্তুতিগানেই আপনাকে পাঠকের আনন্দরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, রোমান্টিক শিল্প কবিতার অনাবিল প্রতিমা এবং প্রমূর্তি-রূপেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভবও কেবল নির্ব্যূঢ়(absolute) সৌন্দর্যবিলাস এবং সৌন্দর্য-মন্দিরের আরতিরূপেই আপনাকে পাঠকের হৃদয় সন্নিকটে আনিয়াই আত্মপরিচয় করিতেছে। যে এই তত্ত্ব না বুঝিল, সে কখনো রোমান্টিক কবিতার আদিপুষ্প তিলোত্তমা-সম্ভবকেও চিনিল না।"[১৭]

এটি আশ্চর্যই মনে হয় যে বস্তুনিষ্ঠ সারস্বত রূপকল্পনার ক্লাসিকেল পন্থী কবি মধুসূদনের হাতেই এই রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনা ধরা পড়েছিল।

কীটসের হাইপেরিয়নের প্রভাবও এ কাব্যের উপরে ছিল একথা মনে করার কারণ আছে। It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own – এই উক্তি মেঘনাদবধ রচনাকালে করে থাকলেও তিলোত্তমা রচনা কালেও তিনি গ্রীক ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন মনে হয়। গ্রীক কিংবদন্তীতে আছে যে দানবরাজ স্যাটার্নের পতনের অব্যবহিত পরে সূর্যলোকের অধীশ্বর হলেন হাইপেরিয়নেরও পতন হয়। দানবের জায়গায় এলেন দেবতারা, জুপিটার হলেন স্বর্গের অধিপতি আর সূর্যলোকের অধীশ্বর হলেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি অ্যাপলো। দেবতারা সবাই রূপবান্; দৈত্যেরা তা নয়। গ্রীক পুরাণে অনুপ্রাণিত কীটস্ও বললেন –

"t is the eternal law

That first in beauty should be first in might.

তাই বিশ্বের অমোঘ ও অনন্তকালব্যাপী নিয়মানুসারেই দেবদানব সংঘর্ষে রূপবান্ দেবতারা জয়ী হবেন। তিলোত্তমাসম্ভবে হাইপেরিয়নের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। দেবতাদের মধুসূদন রূপবান্ করেই দেখিয়েছেন, দানবেরা তুলনায় অপকৃষ্ট। সুন্দরের অধিকারেই স্বর্গ থাকা উচিত, তাই তাঁদের হাতে দৈত্যের পরাভব। যে

---

১৭. শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন, ২য় সং., পৃ ৭৩

অস্ত্র দৈত্যে নিধন হল তা দেবতাদেরই যোগ্য । মহাভারতে সংযম শিক্ষার জন্য যে কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে তার তাৎপর্য পরিবর্তিত করে মধুসূদন তাকে কাজে লাগালেন । রূপসী তিলোত্তমাকে দানবেরা কামনার বস্তু হিসাবে ভোগ করতে চাইল বলেই তাদের পতন । মহাভারতে অসুরনির্মিত দুর্গের ভয়ঙ্কর অবস্থা বর্ণিত আছে । মধু-সূদন তেমন চিত্র না দিলেও তাদের হাতে যে স্বর্গ বিপর্যস্ত হয়েছে সে আভাস আছে —

যথা সুন্দরের কাছে , কুন্দের নিশুম
বাতময় , উত্থলিলে জল সমাকুল ,
প্রবল তরঙ্গকুল , তীর প্রতিধ্বনি ,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
স্বর্ণ কুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ; —
যে সুচারু শ্যামতনু বৃক্ষকুলপতি
বাঁধি নানা ফুলমালা সাজায় আপনি
অঙ্গদেশ, হরে প্লাবন তার আভরণ । ১।১৩-১৭

দুর্দান্ত দানবেরা প্লাবনেরই মত স্বর্গের সৌন্দর্যহরণ করেছে যেন । বীর-দানবেরা জয় করে ভোগ করতে জানে , কিন্তু সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নেই তাদের , তাই তাদের হাতে নন্দনপুরীর সৌন্দর্য পরিম্লান ; তার শচীর পাদস্পর্শে জীর্ণাকৃতি বকুল-বৃক্ষেও ঘটে বসন্তাগম । এই দ্বন্দ্বের তত্ত্বমাত্রই যদি তিলোত্তমাসম্ভবের মূল বাণী হয় তবে কবি কীটসের কাছ থেকে সে প্রেরণা পেয়ে থাকাই সম্ভব । তার হাই-পেরিয়নের মহাকাব্যিক উপস্থাপনার প্রভাবেই তিলোত্তমাতেও মহাকাব্য-লক্ষণ সঞ্চারিত হয়ে থাকা সম্ভব ।

ভাবাদর্শের দিক দিয়ে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব স্বীকার করে নিলেও এ কাব্যের প্রয়োগ-নৈপুণ্যতে দুটি পদে তিনি দেশীয় সাহিত্য পুরাণকে অনুসরণ করেছেন — (এ প্রসঙ্গে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ।) — এতেই প্রমাণিত হয় ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সৌন্দর্যবাদ এবং শিল্পকলা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে অভিনব বাংলা কাব্যের জন্ম দিয়েছে ।

আধুনিকতার আর এক লক্ষণ — স্বদেশ বোধ; তারও উন্মেষ দেখা যায় এ কাব্যেই। স্বর্গচ্যুত দেবতাদের বেদনায় এবং স্বর্গ পুনরুদ্ধারের আয়োজনে সে-বোধের প্রকাশ। পরবর্তী কালে মেঘনাদবধ কাব্যে এই বোধই স্পষ্ট স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত —

জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে
যে ডরে ভীরু, সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।

কিন্তু যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও মানবিকতা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান লক্ষণ, তিলোত্তমাতে তা তেমন ধরা পড়ে নি। দৈত্যভ্রাতার প্রতি তাঁর সহানুভূতির পরিচয় আছে। মহাভারতের মত এমন ভয়ঙ্কর ও কদর্য রূপ তাদের তিনি আঁকেন নি, কিন্তু দেবতাদের দিক থেকে কাহিনী উপস্থাপিত করায় যেমন কাহিনীকে বিপুল ব্যাপ্ত ও বাস্তব করে তোলার অবকাশ ছিল না, তেমনি মানবিকতা বা জীবনবাদ প্রকাশেরও তেমন সুযোগ ছিল না। মেঘনাদবধে রাক্ষস রাবণকেই নায়ক করে কাহিনী পরিকল্পিত হওয়াতে আর সে বাধা রইল না।

তিলোত্তমাসম্ভবে মধুসূদনের কবি-আত্মার পূর্ণ পরিচয় মেলে না — এটি প্রস্তুতির কাব্য। ছন্দপ্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছেন, আর কাহিনীনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ আধারে রোমান্টিক কল্পনা প্রকাশের পথ খুঁজেছেন — তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের মূল্য সেখানেই। মেঘনাদবধ কাব্যে কবির চরম সিদ্ধি এবং প্রসিদ্ধি। এই একখানি কাব্যকে বুঝে নিতে পারলেই তার কবিকেও সম্পূর্ণতঃ চেনা সম্ভব। তাই এ কাব্যে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব ও শিল্পরীতির সম্মিলনটিকে আবিষ্কার করতে পারলেই জানা যাবে কেমন করে কবি মধুসূদন অতীন্দ্রিয়ের উপরে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা যুক্তিবাদকে এবং মানবতা (humanism) — কে স্বীকৃতি দিয়ে সে যুগের উৎকণ্ঠাকেই বাণীরূপ দান করলেন। রেনেসাঁস শব্দের মধ্যেই প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কারের যে ব্যঞ্জনা আছে সে সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সে আবিষ্কার কিভাবে মধুসূদনের সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল সেটাই এখানে দেখতে হবে।

উনবিংশ শতকে ইংরাজি শিক্ষা দেশের মধ্যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে দুর-পনেয় ব্যবধানের সৃষ্টি করেছিল। যুক্তিপন্থের প্রচার এবং ইংরাজি সাহিত্যের

আদর্শে রচিত বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রবর্তনের ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে চলে যেতে থাকে । এই হারিয়ে যাওয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে পুনরাবিষ্কার করে আধুনিক কালের শিক্ষিত লোকের মনে তার যোগ-স্থাপন করার গঠনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ঈশ্বরগুপ্ত থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিম প্রভৃতি মনীষীরা করে গেছেন । এর পিছনে একদিকে যেমন আছে অনুসন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যদিকে তেমনি দেশের প্রতি মমত্ববোধজাত গঠনাত্মক আদর্শ । স্বদেশের প্রতি এই মমত্ববোধের প্রকাশ মধুসূদনের মধ্যেও প্রকাশ পেল — কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়া সচেতনভাবে আর কোন জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা বা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর নয়, নয় জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ আবিষ্কার বা দেশীয় মানসের সঙ্গে সংযোগ করার সচেতন প্রয়াস । তিনি কবি — এই তাঁর প্রথম আর শেষ পরিচয় । তবে তাঁর স্বদেশ চেতনার প্রকাশ মেঘনাদের স্বর্ণলঙ্কার জন্য জীবনপণ সংগ্রামে ; ত্রিলোকজয়ী দেবতাদের স্বর্গচ্যুতির বেদনা ও পুনরুত্থানের প্রচেষ্টায় মর্ত্যপ্রীতি ও স্বদেশচেতনারই বলবৎ । বিভী-ষণের প্রতি মেঘনাদের তিরস্কার বাণীতে যে শাস্ত্র ও ধর্মের উল্লেখ আছে — তা ভারতীয় শাস্ত্র বা ধর্ম নয়, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যসম্মত জাতিপ্রেমের আদর্শকেই সেখানে তুলে ধরা হয়েছে সন্দেহ নেই । আর 'বঙ্গভূমির প্রতি' 'বঙ্গভাষা' প্রভৃতি গীতি-কবিতায় অন্য চরিত্রের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নয়, কবির আত্মকথনের দেশ ও দেশের ভাষার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির বেদনাবিধুর প্রকাশ ।

কবিত্বের প্রয়োজনেই মধুসূদন একদিকে যেমন ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য পুরাণ মহাকাব্য থেকে কাহিনী চিত্রকল্প বাক্‌ভঙ্গিমা গ্রহণ করেছেন, তেমনি মধ্যযুগীয় প্রধান বাঙালী কবিদের রচনা — যা তখন পাওয়া সম্ভব ছিল (মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি) তা থেকেও বিষয় বা চিত্র সংগ্রহ করেছেন ।

স্বদেশচেতনা যেমন সে যুগের লক্ষণ, তেমনি উদার বিশ্বমুখীনতা এবং বিশ্বসম্পর্কে আগ্রহও সে যুগেরই লক্ষণ । এ যুগের মনীষীরা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ এবং দেশীয় ভাষায় তা প্রকাশের চেষ্টায় মগ্ন হয়েছেন, আর মধুসূদন ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করে, হোমার ভার্জিল দান্তে টাসো মিলটন শেক্সপীয়রের রচনা

গ্রহণ করে তাঁদের ভাবসম্পদকে বাংলাসাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ত্রিপুরা-শংকর সেনের উক্তি উদ্ধার করি –

"মধুসূদন প্রতীচ্যের কাব্য-সাহিত্যের উপর্যপুষ্ট হইলেও এবং প্রধানতঃ সেই সাহিত্যকানন হইতে পুষ্পচয়ন (?) করিলেও বাল্মীকি কালিদাস ও কৃত্তিবাসের রচিত কাব্যোদ্যান হইতেও কুসুম আহরণ করিয়া ও উহা যথাস্থানে গ্রথিত করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন মাল্য রচনা করিয়াছেন। ফলতঃ মধুসূদন (একবার মাত্র) নানা দেশ বিদেশের কবিগণের চিত্তনন্দনমধু আহরণ করিয়া এমন এক মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন, যাহা বাংলা সাহিত্যে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।[18]

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় রামায়ণ থেকে নেওয়া একথা সকলেরই জানা। রামায়ণে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু এমন কিছু বড় ঘটনা নয়, লঙ্কার বহু বীর সেনানীর একজন সে, লক্ষ্মণের সঙ্গে তার অমিত পরাক্রমে যুদ্ধেরও বর্ণনা আছে সেখানে, কিন্তু তার মৃত্যু রাবণ রাজার জীবনে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। লঙ্কার বীরসৈন্যদল যখন ক্ষীয়মান, তখন এই মৃত্যু রাবণের ক্রোধ বহ্নিকে দীপ্ত করে তুলেছে ঠিকই, রামচন্দ্রকে নিঃশেষ করার জন্য সে একাই প্রতিযুদ্ধে ধাবিত হয়ে লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে নিপাতিত করেছে। কিন্তু মেঘনাদের মৃত্যু সেখানে রাবণের জীবন-ট্র্যাজেডির চরমতম মুহূর্তরূপে উপস্থাপিত হয় নি। রামায়ণের কাহিনীতে রাবণ পাপী, পাপের শাস্তি দেখে পাঠকের মন বরং প্রশান্ত হয়। রাবণকেই নায়ক করে মধুসূদন যে মহাকাব্য রচনা করলেন সেখানে বাল্মীকি বর্ণিত কাহিনী অপরিবর্তিত রেখেই জীবনের এক অভিনব রূপ উদ্ঘাটিত করলেন – এই নূতন দৃষ্টিকোণটি সৃষ্টির ক্ষেত্রেই তিনি পশ্চিমের ভাবধারায় প্রভাবিত। এ কাব্যের কোন্ কোন্ চরিত্র বা ঘটনা বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে রচিত বা কোথায় ভাষা-অলংকরণে কোন্ কবির রচনার প্রভাব দেখা যায় সে আলোচনা নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার। সমগ্র ভাব এবং চিন্তাকে শিল্পের রূপে চরিত্র অথবা ঘটনার মাধ্যমে পরিমূর্ত করবার আদর্শ-পথে কবি কোন্ নূতন

---

১৮. ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ১ম সং, পৃ. ১৩৭

শিল্পকৌশল অবলম্বন করলেন , এবং তার মূলে কোন্ প্রেরণা ক্রিয়াশীল, সেটাই দেখা দরকার । এক্ষেত্রে তিনি গ্রীক জীবনবাদ ও তাঁর সমকালীন যুগচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — এ ব্যাপারটি বুঝে নিতে পারলেই মধুসূদনের কবিকৃতির প্রকৃত বিচার সম্ভব ।

মেঘনাদবধ রচনায় কবি প্রচলিত নীতিবোধ বা সংস্কার দ্বারা চালিত হন নি । ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্য ধর্মগ্রন্থও বটে , এতে ধার্মিকের জয় এবং অধার্মিকের পরাজয় কীর্তিত আছে । জীবনাচরণের কতকগুলি নীতিও বলা আছে । অন্য সব পুরাণের মত কাহিনীর আকর ও কল্পনার অবাধিত বিস্তারের জন্য দুটি মহাকাব্য দুটিও মধুসূদনের এত প্রিয় ছিল । কিন্তু পুরাণ মহাকাব্যে যে তাৎপর্য ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য , মধুসূদন কখনই তা গ্রহণ করেন নি । তিলোত্তমার আলোচনায় যেমন সে কথা বুঝেছি, তেমনি বীরাঙ্গনাতেও নারীচরিত্রগুলি প্রাচীন কাহিনীর আধারেই নবরূপ ধারণ করেছে । মেঘনাদবধে রাক্ষস রাবণের প্রতি মধুসূদনের সহানুভূতির বশেই যে কেবল পদে পদে দেবতাদের কৃপালাভ করে চলেন যে-রাম তাঁকে দুর্বল করে দেখানো হয়েছে তা নয় , অসীম শক্তি ও অপার ঐশ্বর্যের অধিকারী রাবণের মধ্যে প্রকৃত মানবত্ব ও প্রতিরোধ নিয়তির হাতে তার অসহায়তা চিত্রিত করে মধুসূদন মনুষ্য মাত্রের জীবনের অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণতিকে ফুটিয়ে তুললেন । রাবণের স্বর্ণলঙ্কার অপরিমেয় ঐশ্বর্য চিত্রণে যেন কবির নিজের ঐশ্বর্য-বাসনাই রূপ পেয়েছে । এই রাবণ আর্য রামায়ণের কুৎসিত রাক্ষস নয় , বলে-বীর্যে, প্রজাপ্রীতিতে রাবণ আদর্শ রাজা ; আদর্শ স্বামী স্নেহময় পিতা ও পুরুষ । সীতাহরণের পিছনেও তার মনে কোন পাপ প্রবৃত্তি ছিল না বরং ছিল রাজধর্ম পালনেরই প্রবর্তনা । তবু এক অজ্ঞাত অন্ধ নিয়তি একে একে তার ডালপালা কেটে তাকে দুর্বল করে অবশেষে তাকে নিপাতিত করল । এই নিয়তিবশেই নিহত শত্রু পুনর্জীবন লাভ করে । এই নিয়তি নির্জিত রাবণ তো মধুসূদনেরই কবি আত্মার প্রতিরূপ । দৈবী প্রতিভার অধিকারী হয়েও বাসনার দৈন্য — সৃষ্টি সম্ভূতির দ্বন্দ্ব তাঁর নিজের জীবনও মণ্ডিত হয়ে এক ব্যর্থতার হাহাকারে পরিণত ।

কাব্যের নাম মেঘনাদ নয়, মেঘনাদবধ। ইন্দ্রজিৎ তাঁর favourite তার শৌর্যের জন্য, কিন্তু তাকে নায়ক করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না – তার মৃত্যু একটি ঘটনা, যা রাবণের অসহায়তাকে প্রমাণ করবে। রামায়ণকার যে রামকে নায়ক করেছেন তা তাঁর ধর্মাচারজনিত বিজয় দেখাবার জন্য। ইলিয়াডে হোমার তেমন কোন নীতি বা আদর্শ দ্বারা চালিত হন নি, ট্রয়ের যুদ্ধ এবং তার ফল দেখানোই সেখানে উদ্দেশ্য। তবু দেবরাজ জিউস এবং স্বয়ং মহাকাব্যকারের সহানুভূতি গ্রীকদের প্রতি – যারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। মধুসূদন বিজিতকেই নায়ক করলেন, যার জয়লাভের আশামাত্র নেই তারই প্রতি অন্তরের সমস্ত সমবেদনা উজাড় করে দিলেন। ইলিয়াডের অনুবাদের নামকরণও তিনি 'হেক্টর বধ' করেছিলেন – ট্রয়ের শ্রেষ্ঠ বীরের পতনে বিজিত ট্রয়বাসীর বেদনার সুরটিই যেন সেখানেও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অনুবাদ কর্মের মধ্যেও তাঁর প্রবণতাটি গোপন থাকে নি।

রাবণের প্রতি এই সহানুভূতিতেই কবির মানসিকতার মূল গ্রীক প্রভাবটি ধরা পড়ে। ঊনবিংশ শতকের বাংলায় যে Humanism বা মানবতাবাদের আদর্শ উদ্ভূত হয়েছিল মধুসূদন তাকেই প্রাণের মধ্যে লাভ করেছিলেন। সুস্থ সবল দৃপ্ত ঐশ্বর্যী মানবতা – যা নিশ্চিন্ত ও নির্দ্বন্দ্ব হয়ে জীবনকে নিঃশেষে গ্রাস করতে চায় – যা পদে পদে শাস্ত্রবিধি দ্বারা খণ্ডিত নয়, স্বভাবধর্মে সুন্দর এবং চিরপুরাতন হয়েও যা নিত্যনূতন, এক কথায় যাকে বলা হয় paganism। গ্রীক মহাকাব্যে সেই বলিষ্ঠ জীবনবাদকেই পাওয়া যায়। গ্রীকজাতি মনের সুখলিপ্সু, বহির্দৃষ্টিরত এবং বহিঃসৌন্দর্য মত্ত। ইলিয়াডের চরিত্রগুলি শাস্ত্রাচার বা ধর্মনীতিদ্বারা বদ্ধ নয় – সফল সার্থক জীবনকে তারা স্বীয় শক্তি-দ্বারাই অর্জন ও উপভোগ করে। সেই pagan আদর্শকে বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত আধার তিনি রাবণকেই [redacted] মনে করেছেন – যে রাবণ দুর্ভাগ্যের চরম প্রান্তে পৌঁছেও কখনও রামের কাছে নতি স্বীকার করবার কল্পনাও করেনি। পুত্রের সৎকারের জন্য যে রাবণ রামের কাছে সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল, তা আবার যুদ্ধ আরম্ভ করবারই জন্য। সপ্তদিবানিশি

ক্রন্দনের পরেও লঙ্কার প্রজা আত্মসমর্পণের কথা ভাবে না। নিয়তির প্রহারে রাবণ বিস্ময় বোধ করেছে, পুত্র মেঘনাদ সহ পুত্রবধূ প্রমীলার চিতারোহণে তার অন্তরাত্মা হাহাকার করেছে – তবু সে পরাজয় স্বীকার করেনি। এভাবেই মধুসূদন মানবপ্রকৃতির সেই আদিধর্মের উদ্ঘাটন করলেন – যা বীর্যে ও আবেগে মহিমাময়, কিন্তু যা পার্থিব বলেই বিকাশের পরে কালের মৃত্যুঘাতে করুণ। তাঁর নিজের জীবনেরই যেন এক রূপক রাবণ।

এই গ্রীক জীবনবাদের প্রকাশ হিসাবে বিচারই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির প্রকৃত বিচার। এ সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"...তিনি য়ুরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীকে, এমন কি সেক্সপীয়র ও মিলটনকেও অতিক্রম করিয়া, অক্ত আদি ও অকৃত্রিম উৎস হইতে তাঁহার প্রাণপাত্র পূর্ণ করিয়াছিলেন। কাব্যনির্মাণ-কৌশল, রসাত্মক বাক্য যোজনা, বিচিত্র কল্পনাবস্তু প্রভৃতির জন্য তিনি ভার্জিল দান্তে টাসো মিলটন হইতে বায়রণ মুর পর্যন্ত এবং বাল্মীকি কালিদাস হইতে কৃত্তিবাস কাশীরাম পর্যন্ত, সকলেরই দ্বারস্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কল্পনা ও কাব্যপ্রকৃতি হোমারকে যেভাবে অনুসরণ করিয়াছিল এমন আর কাহাকেও নহে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি হোমারকে ভুলিতে পারেন নাই, — বাংলা গদ্যে হোমারের মূল মহাকাব্যের অসমাপ্ত অনুবাদই তাঁহার শেষ সাহিত্য কর্ম। য়ুনানী কবির সেই আদি কাব্য প্রেরণার সেই সুস্থ সবল মানবতা এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিশ্চিন্ত জীবনধর্মের অনুধ্যানে তিনি নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।"[১২]

আদিম জীবনের ধারক বলেই রাবণ মধুসূদনের দৃষ্টিতে Grand fellow, আর সে জীবনকে অস্বীকার করে বলেই [illegible] Rama। তার নিজের কাব্যকে three-fourths Greek, অথবা একজন গ্রীক যে ভাবে লিখত, সেভাবে মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করার কথার সার্থকতা এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই। মধুসূদনের শিল্পাত্মাই গ্রীক-তন্ত্রী। তবু এই কল্পনার ভিত্তি তিনি রামায়ণ থেকেই পেয়েছিলেন। রাবণের

১২. মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীমধুসূদন, ৩য় বিদ্যোদয় সংস্করণ, পৃ-১৬-১৭

ভীষণ-সুন্দর রূপের কথা রামায়ণে বিভিন্ন স্থানেই আছে। আর তার শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী তো সমগ্র কাব্য ব্যাপী। সুন্দর কাণ্ডে হনুমান লঙ্কা লণ্ড ভণ্ড করার পরে যখন রাক্ষসেরা তাকে বেঁধে রাবণের সামনে নিয়ে এল তখন বন্ধনক্লিষ্ট হনুমান তাকে দেখে অবাক হয়ে ভেবেছিল —

> অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
> অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণ যুক্ততা ॥
> যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
> স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥ সুন্দর, ৪৯, ১৭-১৮

"অহঃ, কি রূপ, কি ধৈর্য, কি শক্তি, কি দ্যুতি! রাক্ষসরাজের সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি এঁর অধর্ম প্রবল না হ'ত তবে ইনি ইন্দ্রসমেত সুরলোকের রক্ষক হতেন।"[১০]

অধ্যাত্মচিন্তাহীন মধুসূদনের কাছে এই অধর্ম বা পাপ অর্থহীন; বলদৃপ্ত রাজা রাবণই তাঁর কল্পনাকে আবিষ্ট করেছে।

এই মানবতাবাদ গ্রীক ইংরেজী সাহিত্য থেকে এসে থাকলেও বাঙালীর জাতিগত প্রবণতাও এর অনুকূল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণজাত নব মানবধর্মের প্রেরণা এবং মধুসূদনের নিজস্ব কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাঙালীর রক্তগত সংস্কার এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল বলা চলে। ভারতীয় বেদান্ত-উপনিষদিক অধ্যাত্মভাবনায় অবাঙ্মনসগোচর সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ভাবের এবং জ্ঞানের চর্চা প্রধান ছিল। বাঙালী সেই নিরাকার নির্বিকল্প ভাবকল্পনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আধারে বারবার সাধনা করেছে। তাদের বৈষ্ণবধর্মে তাই প্রকৃতি ও পরমাত্মার সম্পর্কটিকে রাধাকৃষ্ণের রূপকল্পনায় আরোপিত করেই রসের সাধনা রয়েছে। বাংলায় যে তন্ত্র ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে রসবস্তুকে বিষয় নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি না করে দেহের আধারেই অর্জন করার চেষ্টা দেখা যায়। তাই মানবদেহ বা জাগতিক বস্তু তাদের কাছে অসীম মূল্যবান। কায়া সাধনের দ্বারা নিরাত্মা বা পরমশূন্যকে লাভ করার সাধনা, নিরবয়ব তত্ত্বকে

---

১০. রাজশেখর বসুর অনুবাদ, পৃ. ২৩৬

দেহের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির বাসনায় বাঙালীর তন্ত্রধর্মের জন্মদাতা। রবীন্দ্রনাথও রূপসাগরে ডুব দিয়েই অরূপরতন সন্ধান করেছেন। ভাব ও রূপের পারস্পরিক আনাগোনা বাঙালীর কাছে অস্বীকৃত হয় নি। মানবদেহ ও মানবজীবন বাঙালীর সাধনায় বিশেষ মূল্য ও তাৎপর্য মণ্ডিত। পার্বতী পরমেশ্বরের নিত্যলগ্ন মূর্তির মত দেহ ও আত্মার এই অচ্ছিন্ন কল্পনার ফলে তাদের আধ্যাত্মিকতার চর্চা কেবল দার্শনিকতায় সীমিত না থেকে একটি সাধনতত্ত্ব, আর দেহরূপ আধারের মধ্যেই বুদ্ধত্বের আস্বাদ লাভের প্রচেষ্টায় পরিণত। একে অবশ্যই নিছক দেহধর্ম বা প্রবৃত্তিধর্ম বলা চলে না, ভুক্তি ও মুক্তি এখানে চিরসংলগ্ন।

অর্জিত এই প্রবণতার সঙ্গে বহিরাগত মানবিকতা যুক্ত হয়ে মধুসূদনকে মানুষের জীবন ও তার শৌর্য বীর্য সম্পর্কে এমন আগ্রহী করেছে। জীবনরসকে যেমন তিনি নিজে আকণ্ঠ পান করতে চেয়েছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও তেমনি এই মর্ত্য জীবনেই তাদের অমরত্ব প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত। দেবতা বা রাক্ষস, ধার্মিক বা অধার্মিক, পুরাণ চরিত্র বা সমকালীন চরিত্র সকলেরই একমাত্র পরিচয় তারা মানুষ। মানুষের এই জয়গানই তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কথা — যে মানুষ স্থির বা আধ্যাত্মিক নির্গুণে লগ্ন নয়, অপার সংগ্রামের আবর্তনে যে নিত্যপরিবর্তনশীল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ প্রথম মহাকাব্য। প্রাচীন কালে দেশীয় জনজীবনের মধ্য থেকে সৃষ্ট Epic of Growth অন্যান্য দেশেও ছিল। সে মহাকাব্যকারেরা প্রধানতঃ সংকলক। আমাদের রামায়ণ মহাভারত সেরকমই। কিন্তু মহাকবির ভাবকল্পনা এবং বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে Literary Epic রচনার চেষ্টা বাংলায় ঊনবিংশ শতকে একবারই হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই সে সে ধারা লুপ্ত হয়ে যায়; আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে একান্ত বস্তুনিষ্ঠ কাব্য রচনা সম্ভব নয়। মেঘনাদবধ ক্লাসিক আদর্শে রচিত হলেও সে-যুগের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী রোমান্টিক কল্পনা কাব্যখানিকে বিশিষ্ট করেছে। বীররস-সমন্বিত মহাগীত রচনা করতে বসেও তাই মধুসূদন একে আদ্যোপান্ত করুণরস-সিক্ত করে

তুললেন। রাবণের বক্ষোভেদী শূন্যতাবোধ, সীতা-প্রমীলা-চিত্রাঙ্গদা-মন্দোদরীর বিষাদই শুধু নয়; সমগ্র লংকাবাসী তথা লংকাদ্বীপের বিষাদসুরেই এর মূল সুর; কাব্যটির অন্তিম শব্দও তাই 'বিষাদ'। তার রাবণ চরিত্রে কবি ঘটালেন আত্মপ্রক্ষেপ। মনে রাখতে হবে মধুসূদনের প্রতিভা প্রকৃত মহাকাব্যের অনুকূল নয়, যদিও মহাকাব্যিক বাতাবরণ সৃষ্টিতে তিনি সফল। তিনি নাট্যরচনায় বিপ্লব নিয়ে আসার আশা পোষণ করলেও যে নিবৃত্ত হয়েছিলেন, তার জন্য তখনকার নাট্যশালার অবস্থা ও কাব্যছন্দ ব্যবহারে প্রতিকূলতা দায়ী হলেও আসল কারণ নাটকীয় প্রেরণা তাঁর কবিপ্রকৃতির অনুকূল নয়। কেবলমাত্র বীরাঙ্গনা পত্রিকায় তিনি নাটকীয় বস্তুময়তা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। মেঘনাদবধ মহাকাব্যের চরিত্রসৃষ্টি তাঁর স্বকীয় সুপ্ত দৃষ্টি প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

এই মহাকাব্য রচনায় তিনি গ্রীক কবির অনুশিষ্য মিলটনকে অনুসরণ করেছেন কেবলমাত্র ছন্দ সংগীতের দিকে। মিলটনের উদাত্ত কঠোর মনোভাব ও ধর্মবিশ্বাস অথবা দান্তে টাসোর মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় মনোভাব তাঁর কল্পনার অনুকূল ছিল না। ইলিয়ডের অবিরত যুদ্ধ বর্ণনাও তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে কাহিনী বা চরিত্র গ্রহণ, বর্ণিত অলংকরণে এগুলির কাছে ঋণের কথা মনে রেখেই বলছি।

He who is "beautiful", "tender" and "pathetic", with a dash of "sublimity", is sure to float down the stream of time in triumph.[১১] এতেই তাঁর প্রেরণার স্বরূপ ধরা পড়ে। রামায়ণের কাহিনীকে গ্রীক জীবনদর্শনে প্রতিষ্ঠিত করেই এ কাব্য রচনা হয়েছে। তদুপযোগী সংস্কৃতবহুল অভিজাত গম্ভীর ভাষা এবং ছন্দ প্রবাহ সৃষ্টিতেই তাঁর শিল্পসিদ্ধি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারে পাশ্চাত্ত্য কাব্যের বাক্যরীতির ধারাগতি সঞ্চারিত করা সম্ভব হ'ল বলেই তাঁর উচ্চকল্পনা এবং ভাবোচ্ছ্বাস ও তরঙ্গোন্মাদ মাধ্যম লাভে সার্থক হ'ল। এই ছন্দ ব্যতীত তাঁর মহাকাব্য রচনা কখনই সফল হ'ত না।

---

১১. ৩১নং পত্র

"শব্দের বাহ্যিক মেলবন্ধনের কবল হইতে ছন্দকে উদ্ধার পূর্বক উহাকে প্রবাহিত হৃদয়ভাবের প্রবাহে ছাড়িয়া দিতে – ছন্দকে সম্পূর্ণ ভাবানুগত করিয়া প্রবাহিত করিতে, অন্যদিকে হৃদয়জাত সকল হর্ষ-বিষাদের কম্পনস্পন্দিত বাক্যে ধ্বনি-প্রকৃতির মধ্যে চিরকালের জন্য ধৃত করিয়া রক্ষা করিতে, সর্বোপরি, শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের বিপুল-শব্দতরঙ্গ ধারায় পাঠকের হৃদয়কে বন্যবেগে ছুটাইয়া লইতে, এইরূপ সৃষ্টির শক্তি-প্রচণ্ডতা, এইরূপ যোগ্যতা, এইরূপ অপরিহার্যতা ইতিপূর্বে আর কোন বাঙ্গালী কবি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহা পশ্চিমের অতলান্ত সমুদ্রেরই দান।"[১১]

ভাষারীতি বা ছন্দ ছাড়াও কাব্যের গঠনরীতি (technique) ক্ষেত্রে মধুসূদন গ্রীক আদর্শকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন। রামায়ণ মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগের রচনায় দেখা যায় এক একটি সম্পূর্ণ ঘটনাকে তার বীজ থেকে, এমন কি তারও পূর্বে আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক অবস্থা থেকে আরম্ভ করে তার চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত, এমন কি তার সাংসারিক ও পারলৌকিক নিয়তি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ধারাবাহিক আখ্যানকাব্য রচনারই প্রথা ছিল। কিন্তু হোমারের ইলিয়াডে দশবর্ষব্যাপী ট্রয় অবরোধের মাত্র শেষ কিছুদিনের কাহিনী বিবৃত। আকিলিউসের ক্রোধ ও সমর বিরতির পূর্বমুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে ট্রয়বীর হেক্টরের মৃত্যু ও সৎকারের বর্ণনাই এই মহাকাব্যের উপজীব্য। মধুসূদনও মেঘনাদবধে লঙ্কার যুদ্ধের খণ্ডাংশকেই গ্রহণ করেছেন। 'লঙ্কাভরসা' ইন্দ্রজিৎকে সেনাপত্যে বরণ, তার নিধনের আয়োজন ও নিধন এবং তার সৎকারে কাব্য সমাপ্ত করেছেন।

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের খণ্ডাংশের মধ্যে মূল কাহিনী সীমাবদ্ধ হলেও মধুসূদন এর মধ্যেই সুকৌশলে রামায়ণের সাতটি সর্গের কাহিনীকে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এ কাজ তিনি করেছেন চতুর্থ সর্গের মাধ্যমে – যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই সর্গটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। সরমার কাছে স্মৃতিচারণায় অশোকবনে বন্দিনী সীতা তাঁর পূর্ণ কাহিনী বিবৃত করেছেন। সরমার –

---

১১. শশাঙ্ক মোহন সেন, বঙ্গবাণী, ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী, ১৯১৫, পৃ. ১৬

দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব সুমধুর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি ।—৪।১৩১-৩৩

এই উক্তিতে বালকাণ্ড এবং অযোধ্যা কাণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ । রাবণের সীতা-হরণ ও লঙ্কায় আনয়নের কাহিনী অরণ্য কাণ্ডের । এর মধ্যে সীতার পঞ্চবটী বনে শান্ত পরিতৃপ্ত জীবনের স্মৃতি বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে আছে । জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাবণ সীতাকে ভূতলে ফেলে রেখেছিল, তখন সীতা পালাতে চেষ্টা করেও পারলেন না ; মূর্ছিত অবস্থায় তিনি যে স্বপ্ন দেখলেন তার মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বালীবধ-সুগ্রীবের বন্ধুত্ব ইত্যাদি কাহিনী এবং যুদ্ধকাণ্ডে সমুদ্র-বন্ধন, বানর সেনার যাত্রা, বিভীষণের রাম পক্ষে যোগদান কুম্ভকর্ণ বধ ইত্যাদি সবই আছে । রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডে ত্রিজটার রাবণসহ রক্ষবংশের পতন ও নরকগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ও সীতাসহ রামের উভয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের কথা আছে । মধুসূদনের কাব্যে ত্রিজটার বদলে সীতার স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দর্শনের মধ্য দিয়ে সুন্দরকাণ্ডও মূল কাহিনীতে যুক্ত হল । যে সময়ে সীতা স্বপ্ন দেখেছেন তখনের পক্ষে এগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনা হলেও যখন সরমার কাছে বলছেন তখন কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ডের ঘটনা অতীতের কথা । কিন্তু এরও পরের কাহিনীও আছে সুপ্রকটিত স্মৃতিচারণায় । যুদ্ধান্তে রামের সঙ্গে সীতার প্রত্যাবর্তন, এবং —

রতন খনির গর্ভে জাগে, কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা । ৪।৫৭১-৭২

মধুসূদনের এই উক্তির মধ্যে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নৃপতি রামের সামনে সীতার অগ্নি পরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশের বা এগুলির সম্ভাবনার কাহিনীতে উত্তর কাণ্ডেরও সংযোজন ঘটল । আর যিনি তাঁকে ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দেখিয়েছিলেন সেই 'বসুন্ধরা সতী মা আমার' এর উল্লেখে হলরেখা-সম্ভূতা সীতার জন্ম কাহিনীও অজ্ঞাত থাকে না । এভাবে যুদ্ধকাণ্ডের মধ্যেই সপ্তকাণ্ড রামায়ণের স্বাদ লাভ করে পাঠক । এর পরে আবার জটায়ু-যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন সীতা ।

হোমার মিলটন যেমন তাঁদের মহাকাব্যকে একটি কাহিনীর সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ না রেখে দীর্ঘ এপিক উপমায় পুরুষ পৌরাণিক কাহিনীর আনয়নে মহাকাব্যের প্রতিফিক-ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন, অথবা এলিজাবেথীয় যুগে যেমন নাটকের মধ্যে নাটকের অবতারণা করা হত, চতুর্থ সর্গে স্মৃতিচারণায় কাহিনীর মধ্যেও পূর্ব কাহিনী এনে মধুসূদন একই উদ্দেশ্য সাধন করেছেন — যদিও তিনি কারোরই অংশ অনুকরণ করেন নি । পূর্ব-কাহিনীর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস সূচিত করে — এবং 'তোর হেতু সবংশে মজিবে অধম' (৪।৪৫৩-৫৭) এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির আভাস দিয়ে তিনি মহাকাব্যের গৃহীত সত্যটি এবং রাবণের নিয়তির পূর্বাভাস দিয়ে রাখলেন । স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দর্শনের এই রীতি মধুসূদন বীরাঙ্গনার ভানুমতী পত্রিকাতেও অবলম্বন করেছেন । ভীমের প্রতিজ্ঞার ফলে কুরুক্ষেত্র মহারণে দুর্যোধনের পরিণতির আশঙ্কায় ব্যাকুল ভানুমতী তার পত্রে যেমন ঐ যুদ্ধের পূর্বের ঘটনাবলী উল্লেখ করেছে তেমনি স্বপ্নে কৌরব-পক্ষীয় ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং গদাঘাতে ভগ্নউরু দুর্যোধনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে বিষাদগ্রস্ত হয়েছে । এভাবে পত্রিকাটিতে কবি মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ ও পরিণাম স্বল্প পরিসরে ধরে দিয়েছেন । স্বপ্নদর্শনের এই রীতি হোমারের মহাকাব্যে বহুবার অবলম্বিত হতে দেখা যায় ।

এ ছাড়াও মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভ ও সমাপ্তিতে ইলিয়াডের সুস্পষ্ট অনুকরণ, সচেতনভাবে স্থান কাল ও ঘটনার ঐক্য বজায় রেখে কাল্পনিক কাহিনীকে বিশ্বাস যোগ্য ও যুক্তি-নিষ্ঠ করে তোলা, ঘটনার চরম মুহূর্ত ও ভাবের চরম উচ্ছ্বাস একই সঙ্গে সৃষ্টি করা — এসব কাব্যদেহের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব । মধুসূদন যে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না ।

গ্রীক দেব চরিত্র অনেকাংশেই মধুসূদনের দেবদেবী চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে । অমানুষিক শক্তি ছাড়া গ্রীক দেবতাদের আর কোন দৈবী মহিমা নেই । হিংসা, কলহ, লোভ, পক্ষপাত, ক্রূরতা, খলতা ও মদমত্ততায় কলঙ্কিত দেবদেবীরা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের । তাঁদের কোন নীতি বা ধর্মাধর্ম ন্যায় অন্যায়

বোধ নেই। মধুসূদনের কাব্যেও দেবতাদের মহিমা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ, হীন স্বার্থবুদ্ধি ও ক্ষমতালোলুপতায় তাঁরা বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রী। অবশ্য মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গল-কাব্যেও দেবতাদের ক্ষুদ্রপ্রকৃতিই লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক মহাদেব ভবানী ইন্দ্র শচী প্রভৃতির মহিমা মেঘনাদবধে লঙ্ঘিত হয়েছে। পদ্মাবতী নাটকেও শচী রতি মুরজা ঈর্ষান্বিত ও কুচক্রী। তবু মধুসূদনের ভারতীয় মন দেবতাদের তেমন হীন পর্যায়ে নামায় নি। তাঁদের সম্পর্কে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি এবং তাঁদের বিভিন্ন নামের সার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়। তবু মধুসূদন যে পৌরাণিক দেবদেবীদের নিয়ে কাহিনী সৃষ্টি করলেন, মানুষের মতই আচরণ এবং সুখদুঃখানুভূতির বর্ণনা দিলেন, এককথায় দেবতাদের নিয়ে যে mythology সৃষ্টি করলেন, সেই কল্পনাটাই গ্রীক প্রভাব জাত। বেদেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রাণময় রূপ কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই anthropomorphism নয় শুধু, তাদের মানবিক আচরণের গল্পকাহিনী রচনা — এটা গ্রীক আদর্শ থেকেই নেওয়া। কেবল ভারতীয় কল্পনাদর্শে তাঁদের চরিত্রকে বিশিষ্ট করে নিয়েছেন মধুসূদন।

হোমারের মতে অমিতশক্তি দেবতারাই মানব-নিয়তিরূপ শক্তিপুঞ্জ, আর মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতারাও নিয়তির ঊর্ধ্বে নন — এটা লক্ষ্য করবার মত। তিলোত্তমাসম্ভবে ইন্দ্র নিয়তি-নির্দিষ্ট অসহায়তার প্রতীক, আর মেঘনাদবধে অচিন্ত্য-হেতুক দৈবাদৃষ্ট বলে যেমন ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণের উন্নতশির ভিখারী রামের কাছে নত হতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি ভক্তবৎসল মহাদেবকেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হয়—

পরম ভকত মম নিকষানন্দন,
কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে দুষ্টমতি;
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে
কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি? ২।৪২৯-৩৩

যে রাবণকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করেন, তাকেই এমন আঘাত হানা দেবাদিদেবেরও নিয়তি। ভক্তের বেদনায় আরাধ্য দেবতার মন বেদনাভারাতুর।

বিরস বদনে এবে কৈলাস সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিঃশ্বাসি ধূর্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা "হে দেবি।
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে। যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে।
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি। তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি দেখিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক। চিরস্থায়ী, হায় সে বেদনা —
সর্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে। ৭।৪৪-৫৫

রাবণের পতনের পিছনে এক অদৃশ্য জীবন-পরিচালক নিয়তি-চক্র কাজ করে চলেছে। এই নিয়তি দেবমণ্ডে প্রমূর্তি গ্রহণ করেছে — রাবণের মুখে 'বিধি' বা 'বিধাতা' দ্বারা এই অদৃষ্ট মহাশক্তিকেই বোঝাচ্ছে। চিত্রাঙ্গদা রাবণের প্রতি তিরস্কারে একে কর্মফল ব'লে নির্দেশ করলেও রাবণ নিজে তা মনে করেনি, তার মনে কোন পাপবোধ ছিল না ব'লে অমোঘ বিধি লিপিতে তার মনে বিস্ময়ই জেগেছে শুধু; তবুও রাবণ দুর্বলের মত বিলাপ করেনি —

নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি, তেঁই শুধাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে? ৭।৩৭১-৭৪

গ্রীক জীবনবাদ এবং নিয়তিবাদ দিয়ে এতদূর পর্যন্ত বোঝা যায়, কিন্তু এই নিয়তিরূপী দেবতারাও যে নিয়তি-বশ এ কল্পনা সত্যই অভিনব। তবে গ্রীক সাহিত্য শিল্পের আদর্শ যে humanism বা মানবতা, তারই বশে দেবতারা মূর্তিত

আসন থেকে মর্ত্যের সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এসেছেন — তাঁরাও মানবিক সুখ-দুঃখ এবং প্রবৃত্তভাবের অধীন। আর এই মানবত্বের ফলেই রাক্ষস রাবণ মহা-মানুষে পরিণত — অসহ্য পীড়াতেও যে আত্মাদর ত্যাগ করে না। এই [illegible] শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সাহিত্যেই নূতন। এতদিন আমরা সংস্কৃত আদর্শের ধীরোদাত্ত ধীরললিত প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণান্বিত নায়কের মধ্যেই পরিচিত ছিলাম। সব নীতি সংস্কারের ঊর্ধ্বে, কেবল আত্মশক্তি ও জীবনরসসম্ভোগের তীব্রতায় এমন সজীব বলিষ্ঠ মানুষের নিয়তিশাসনপ্রভাব করুণ চিত্র ইতিপূর্বে ভারতীয় পাঠকের চিত্ত বিমথিত করে নি।

মনে রাখতে হবে রাবণ কেবলই ট্র্যাজেডির নায়ক নয়, সে মহাকাব্যের নায়ক। তার শোকও বীরোচিত, বীরকর্মে শোক ভোলে সে। আর, বেদনার অসহ্যতায় সে একাকী হলেও — একটি রাজ্যের রাজা, একটি জাতির মুখপাত্র সে। সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ তার মুখাপেক্ষী, সমস্ত প্রজার সুখদুঃখ মান অপমানের জন্য সে দায়ী। তেমনি তার শোকে লঙ্কাবাসী বিষণ্ণ। রাবণপুত্র মেঘনাদ তো কর্বুর কুলের গর্ব, লঙ্কার পঙ্কজ-রবিও বটে।

মেঘনাদ মত পুত্র, এ বারতা শুনি
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্বুরকুলে। ৭।৩৬৪-৬৫

হোমারের কাব্যের প্রতিটি বীর যেমন সে জাতিরই প্রতিভূ, মধুসূদনও ইন্দ্রজিৎ রাবণকে সেভাবেই দেখালেন। ট্র্যাজিক নায়ক তাঁর হাতে এপিক নায়কও হয়ে উঠেছে। আকিলেউসের ক্রোধের মত রাবণের ক্রোধ দিয়েই এ কাব্যের আরম্ভ; শোকের অভিঘাতে মুহ্যমান না হয়ে সে রোষ প্রদীপ্ত হয়ে উঠে শেষে এক মহৎ শোকের করুণ পরিসমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে। এখানেই মধুসূদন গ্রীক মহাকাব্যের শুধু অনুকারক না হয়ে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। কাব্যশেষে কেবল রাবণ নয়, সমগ্র লঙ্কাদ্বীপই মগ্ন দিবানিশি ক্রন্দনেরত।

মূল ভাব, মূলকাহিনী ও নায়ক চরিত্র ছাড়াও নানা দিকেই গ্রীক মহাকাব্য

এবং ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শ মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদনকে প্রভাবিত করেছিল। কাব্যটির প্রতি সর্গের বিস্তারিত আলোচনায় (তৃতীয় অধ্যায়) আমরা সে সবের উল্লেখ করব। তবু এখানে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা যায়।

ইলিয়াড মহাকাব্যের মতই কাহিনীর একটি খণ্ডাংশকে মধুসূদন গ্রহণ করেছেন সে কথা আমরা উল্লেখ করেছি। সে কাহিনীর উপস্থাপনাও ভারতীয় মহাকাব্যাদর্শের মত বিস্তৃত আখ্যান ধর্মী নয় বরং নাট্যধর্মী ও সংহত, এবং এক-মুখী। এরই মধ্যে কৌশলে সীতার মুখে অরণ্যকাণ্ডের রামসীতা কেন্দ্রিক কাহিনী, পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের বিদায় কালে মন্দোদরীর মুখে ইন্দ্রজিতের প্রথম ও দ্বিতীয়-বারের যুদ্ধে বীরত্বের কথা এবং প্রথম সর্গে রাবণের মুখে – হায় সূর্পণখা। কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী – প্রভৃতি উক্তিতে সীতা হরণের সংবাদটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থন কৌশলটি অনেকাংশেই গ্রীক কাব্যের অনুসারী।

দ্বিতীয় সর্গে মোহিনী বেশ ধারণ করে ভবানীর মহাদেবকে মোহিত করে ইন্দ্রজিৎ-নিধনের অস্ত্র সংগ্রহের কাহিনীতে যে তিনি ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের অনুসরণ করেছিলেন তা নিজেই স্বীকার করেছেন।[13] আর অষ্টম সর্গে নরক বর্ণনাতেও সঙ্গতভাবেই ভার্জিলের ইনিড কাব্যের সুস্পষ্ট প্রভাবিত।[14] ঘটনা ছাড়াও ভার্জিলের অন্যতর প্রভাব আছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে ভার্জিল প্রথম আলংকারিক মহাকাব্য (Literary Epic) কার। গ্রীক কাহিনী নিয়ে তিনি নিজের মনের মত করে কাব্য রচনা করেছেন – গ্রীক মহাবীরদেরও মানসিক প্রেম কোমলতা ও কারুণ্যে সিঞ্চিত করে নিয়েছেন। কাব্যারম্ভে মঙ্গলাচরণে যে বাগ্দেবীর ওপরেই কাব্যরচনার ভার ছেড়ে না দিয়ে নিজে গাইবার কথা বলেছেন, মধুসূদনের মধ্যেও সেই একই ভঙ্গি। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রথম আলংকারিক মহাকাব্যকার মধুসূদনের কাব্যে কেবল রূপপ্রভাব নয়, সম্ভবতঃ ভার্জিলের প্রভাবেও রামায়ণের প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষস মানবিক হৃদয়ানুভূতিতে মর্ত্য মানুষই হয়েছে। রাবণ তো কেবলই প্রতিশোধ পরায়ণ শূর নয়, শোকসন্তপ্ত বিষণ্ণ মানুষও। এরই ফলে যে

---

১৩. ৬৩নং পত্র

১৪. ৬৬নং পত্র

কাব্যের ভাষাতেও লালিত্য এসেছে সে বিষয়ে কবি নিজেই বলেছেন –

... I say that in my heart I begin to believe that this Meghnad is growing up to be a splendid Poem ! I fancy the versification more melodious and Virgilian and the language easy and soft.[২৫]

অবশ্য হোমার, ট্যাসো এবং বাল্মীকির অনুসরণও কম নয়। সপ্তম সর্গে রাম পক্ষে দেবতাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, রাবণকে রুদ্র তেজে পরিপূর্ণ করে পরোক্ষতঃ মহাদেবকেও দেবশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধে নামানো, লক্ষ্মণের মৃতদেহ দেহ অধিকার করার জন্য রাবণের চেষ্টা ইত্যাদিতে গ্রীক মহাকাব্যের স্পষ্ট অনুসরণ। আর প্রমীলা চরিত্রটি বিশেষভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবজাত – এমন কথা বহু সমালোচক ব্যক্ত করেছেন। সীতা-সরমা বা মন্দোদরী-চিত্রাঙ্গদার চরিত্র ভারতীয় আদর্শের অনুরূপ। মাতৃত্ব, পতিপ্রাণতা, কোমলতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রভৃতি গুণ চিরকালই এদেশীয় সাহিত্যে কীর্তিত হয়ে এসেছে। বীররমণীর উপাখ্যানও কম নেই। তেজস্বিনী দ্রৌপদী, কাশীরামের প্রমীলা অথবা ধর্মমঙ্গলের বীর নারীদের সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত; রঙ্গলালও তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যানে রমণীর তেজস্বিতা ও বীর্যের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু প্রমীলা কেবল বীর নয়, সে একই সঙ্গে বীরাঙ্গনা এবং পতিপরায়ণা প্রেমিকা। মধুসূদনের বীরাঙ্গনারা সকলেই স্বাধীন প্রেমেই বীর; কিন্তু প্রচলিত নীতি বা সংস্কারকে অস্বীকার করে নিঃসংকোচ উচ্চকণ্ঠে নিজ হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করা ছাড়া তাদের আর কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। অথচ মহাভারতে বিদ্রোহিনী জনার রণক্ষেত্রে ছুটে যাবার কাহিনী থাকলেও মধুসূদন তার পত্রিকায় আত্মবিসর্জনের কথাই শুধু বললেন। আবার এদেশের ইতিহাসে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বা পাশ্চাত্য সাহিত্যে টাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ডের ক্লরিন্ডা, ভার্জিলের ঈনিড কাব্যের ক্যামিলা বা ইলিয়াডে অ্যামাজনীর রণসজ্জার কথা জানা গেলেও তাদের প্রেমসর্বস্বতার পরিচয় নেই। প্রমীলা

২৫. ৬৩নং পত্র।

একান্তভাবেই প্রেমিকা — এই প্রেমের জন্য যেমন চিত্তাম্বেষণে সে অকুণ্ঠিত, তেমনি শত সখী নিয়ে রণসাজে সজ্জিত হয়ে রামসৈন্য ভেদ করে লঙ্কা প্রবেশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নিঃসংকোচ। মধুসূদনের সমকালে নারীমুক্তির যে আয়োজন চলেছিল, তার মধ্য থেকেই প্রমীলার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কল্পনা এসেছে — যে স্বাতন্ত্র্য প্রেমের পরবশতা স্বীকার করেও স্বাধীন। এ চরিত্রকে গ্রীক বা পাশ্চাত্য বলা যায় না, এ মধুসূদনের স্বাধীন কল্পনার অভিনব সৃষ্টি। মেঘনাদকে যদি কাব্যের নায়ক বলা না যায়, তবে প্রমীলাকেও নায়িকা বলা চলে না; তবু প্রমীলা উজ্জ্বলতম নারী চরিত্র; — কবির [illegible] ইন্দ্রজিতের বীরত্বের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ হৃদয়টির পরিচয় দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলে তার মৃত্যুর বেদনাকে তীব্রতর করে দেখাবার জন্যই প্রমীলা চরিত্রের প্রয়োজন; এই প্রয়োজনেই কবি প্রমীলাচিত্রে একটি সম্পূর্ণ সর্গ ব্যয় করলেন; তাছাড়াও প্রথম চতুর্থ পঞ্চম সর্গে তার প্রেমিকাচিত্র ও ব্যাকুলতা এবং নবম সর্গে তার বিরহিণী শোকসন্তপ্ত রূপ এবং অগ্নিশিখাস্পর্শে স্বর্গগমনের দৃশ্য। প্রমীলা যে কবির মানসী-কন্যা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গ্রীক ও পাশ্চাত্য উভয় প্রবণতাকে আত্মসাৎ করেই মধুসূদনের কবিমানসটি গড়ে উঠেছিল, তাই বিবিধ পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে দেশীয় চিন্তাভাবনা এবং তার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যলোক মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। সর্বত্র এগুলিকে আলাদা ভাবে চিনে নেওয়াও সম্ভব নয়, কিন্তু দুনিয়ার কবিকুলের সব কিছু জীর্ণ করে, নিজের শিল্পী মানসের স্পর্শে সঞ্জীবিত করে যা তিনি রচনা করে গেলেন তা একান্তভাবেই তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি। শশাঙ্কমোহন সেনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যায় —

"মধুসূদন ভাষা ও ভাবের অত্যুন্নতি, ঔদ্ধত্য এবং পরিস্ফুট বস্তুবাদ বিষয়ে একদিকে যেমন হোমারের শিষ্য ছন্দের প্রবাহ-শক্তি বিষয়ে যেমন ভার্জিল ও মিল্টনের শিষ্য। রমণীয় মধুরতা বিষয়ে যেমন ট্যাসোর (Tasso) অনুগামী। ভাবকল্পের সমুচ্চ বিভাবনা বিষয়ে যেমন দান্তের সমধর্মা, তেমন অন্যদিকে কাব্যে আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তি-বাদ বিষয়ে পেত্রার্ক (Petrarch) হইতে আধুনিক বায়রণাদির সঙ্গে

দীক্ষিত। আবার ইঁহাদের মধ্যেই আমাদের শ্রীহর্ষ, কালিদাস ও ভবভূতির এবং কৃত্তিবাস কাশীরামের ভাষা ও রসাদর্শের অপরূপ সঙ্গতি করিয়া অনির্বচনীয় স্বাভাবিকতা, সুসমত সরলতা এবং পরিপূর্ণ আত্মসাম্যে ব্যক্তিরূপেই মধুসূদন দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে, বলিতে গেলে ভারতীয় সাহিত্যে এই প্রথম ইয়োরোপ ও-এর 'মিলন'-দীক্ষিত ব্যক্তি।... ভারতীয় হৃদয়ের পক্ষে ইয়োরোপ পথে অনর্গল বিহার করিবার সাধ্য এতো কেবল এই ব্যক্তিটির মধ্যেই ছিল।"[26]

মেঘনাদবধ মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এ কাব্যটিকে বুঝে নিতে পারলেই মধুসূদনের কবিমানসের স্বরূপ ধরা পড়ে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি নিজেও তখন নিঃসংশয় হয়েছেন, তাই রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন –

But you know I am "smit" with the love of sacred song". There never was a fellow more madly after the muses than your poor friend ! Night and day I am at them.[27]

এ কাব্য রচনার সময়েতে তাঁর সৃষ্টি-চিত্তের প্রকাশ ঘটেছিল, তাই সদর পরীক্ষা না দিয়ে, অর্থ উপার্জনের চিন্তাকে কিছুকাল স্থগিত রেখে এ কাব্যরচনাতেই একান্তভাবে মগ্ন থেকেছেন It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money.[28]

প্রবল আবেগের উত্তাপ তরঙ্গে তাঁর কবিমন আন্দোলিত হয়েছে – ... I have fits of enthusiasm that come on me occasionally, and then I go like the mountain torrent.[29]

---

২৬. শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন, ২য় সং, পৃ. ১০

২৭. ৫১নং পত্র

২৮. ৬১নং পত্র

২৯. ৫৯নং পত্র

কেবল খেয়ালের বশে এবং শক্তি যাচাইয়ের জন্য লেখা নয়, প্রকৃত কাব্য প্রেরণা তাঁকে industrious dog[৩০] করে তুলেছে। এ কাব্য রচনা করে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে এটাই দোষেগুণে মিলে তাঁর সার্থকতম রচনা এবং এখানেই তাঁর শক্তির সীমা। তাই এই শ্রেণীর কাব্য আর লিখলেন না। ভারতবৃত্তান্ত, সুভদ্রা হরণ, দুর্যোধনের মৃত্যু বা সিংহলবিজয় কয়েক পংক্তি রচনার পরেই পরিত্যক্ত হল।

I am afraid it will not be an easy thing to beat Meghnad.[৩১]
অথবা – I suppose I must bid adieu to heroic poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something like a repetition.[৩২]

এ কথাও আমরা বুঝে নিয়েছি যে জীবনের বিচিত্র ভাবাবেগের বা রূপরসের স্বতঃস্ফূর্ত সরল ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশে এ কাব্য প্রকৃত মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত হলেও রূপগুণে, কবির ব্যক্তি-চিত্তের উৎকণ্ঠা ও আকাঙ্ক্ষা এবং রোমান্টিক লিরিক ধর্ম মেঘনাদবধকে মহাকাব্য-লক্ষণ থেকে কিছুটা বিচ্যুত করেছে। এ কাব্য কবির নিজের জীবনেরই এক রূপক। নাই বা হল খাঁটি মহাকাব্য, এটি যে উৎকৃষ্ট কাব্য এবং মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণেই সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন –

"মধুসূদনের মেঘনাদবধই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্তি। তাহার পূর্বে বা পরে তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কবিমানসের কাব্যকলা-কুতূহল প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার নাটকগুলিতে নবতর আদর্শের জন্য উৎফুল্লতাই আছে – নাট্যকলার রূপসাধনই তাঁহার অভিপ্রায়। ...'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' এই দুই কাব্যের একখানিতে তিনি পুরাতনের নামমাত্র রক্ষা করিয়া নূতন ভঙ্গীতে গীতিকাব্য

৩০. ৭০নং পত্র

৩১. ৭০নং পত্র

৩২. ৬৭নং পত্র

রচনার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ; 'বীরাঙ্গনায় একটি সম্পূর্ণ নূতন form বা রচনা-ভঙ্গী বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিলেন । এই দুই কাব্যের ভাব-কল্পনা খুব গভীর নহে — কাব্যকলার সংস্কার ও সমৃদ্ধিসাধনই ইহাদের একমাত্র সার্থকতা ।"[৩৩]

তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাকেও মোহিতলাল কাব্যরূপে উৎকৃষ্ট মনে করেন নি ।

"সনেট কেবল চতুর্দশপদী কবিতাই নয় — একটি সহজ সরল ভাব বা চিন্তাকে উপমা-অলঙ্কার সাহায্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পদে আবেগমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহা উৎকৃষ্ট সনেট হয় না ; ছন্দোবন্ধের দুরূহ কারিগরির মধ্যে এবং সুদৃঢ় পঙক্তির বাগ্বন্ধের গাঢ়তায়, ভাব প্রতিপদ আবেগ গভীর হইয়া উঠে বলিয়াই সনেট সার্থক কবিতা এত যথার্থ হইয়াছে । এ সকল ধারণা যাহাদের নাই, তাহারাই মধুসূদন মহাকবি বলিয়া, তাঁহার সর্ববিধ কাব্যচর্চাকে সমান মূল্য ও মর্যাদা দিয়া থাকে ।[৩৪]

সমালোচকের কাছে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যটি ছাড়া অন্য সাহিত্য কীর্তির মূল্য নগণ্য হলেও সেগুলির মধ্য থেকে কবির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতির সম্পর্কে প্রবণতার অনুপাতটি ধরা সহজ হয় । সেদিক থেকে কাব্যগুলির মূল্য নগণ্য নয় ।

ব্রজাঙ্গনায় রাধার বিরহ উপজীব্য বলে একে বৈষ্ণব পদের পর্যায়ভুক্ত করে বিচার করা কিন্তু কবির প্রতি অবিচার । বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী একটি রূপকমাত্র , এর মধ্য দিয়ে একটি সূক্ষ্ম ধর্মীয় তত্ত্বকেই প্রকাশ করা হয়েছে । পদকারেরা সকলেই সাধক মহাজন । তবু সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে মানবীয় এবং জাগতিক আচরণের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করা হয়েছে । রাধার প্রেমের আর্তির উদ্দিষ্ট তাৎপর্য যাই হোক, প্রেমের অলৌকিক সৌন্দর্য , রাধার তন্ময় প্রেমবিহ্বলতা ও জগৎবিস্মৃত গভীর প্রেমের মহিমাও এতে উদ্ভাসিত ; তাই পদাবলী উৎকৃষ্ট গীতি-সাহিত্যও বটে । অনুভূতির তীব্রতা ও সর্বময়তা এবং প্রকাশভঙ্গীর দৈবী সংক্ষিপ্ততে

---

৩৩. মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীমধুসূদন, তৃতীয় বিদ্যোদয় সং., পৃ. ১

৩৪. ঐ , পৃ. ২৭

পদকারেরা বহিঃশ্রাব্য অনুভবেও হৃদয়ের দ্বারে উপনীত করেছেন ।

ভিন্নভক্তির প্রতি অনুরাগহীন মধুসূদনের কাছে প্রেমের এই মানবিক দিকটির সৌন্দর্যই আকর্ষণীয় বোধ হয়েছিল । বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রেমের উচ্চতম স্তরে উপনীত হবার কথা তিনি বললেন না, রাধার বিরহই তাঁর বর্ণিতব্য ; মিলন সূচক পর্যায় রচনার বাসনা আর প্রকাশিত হয় নি । তাঁর রাধা পরমাত্মা-উন্মুখ মানব সমাজের প্রতিনিধি নয়, সে Mrs. Radha, যে নাকি 'is not a bad woman after all' । বন্ধুকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন — When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. রাধাকে নিয়ে মানবী প্রেমের উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা সম্ভব, তা যে হয় নি তার কারণ — It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.৩৫ এর দ্বারা তিনি পদকারদের চাইতে কবিওয়ালাদের স্থূল কল্পনার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন মনে হয় । ঈশ্বরগুপ্ত-এর সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় ছিল, তারও প্রমাণ আছে । তবু এটা স্পষ্ট যে রাধাকে নিয়ে তিনি মর্ত্য প্রেমেরই কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন, আর প্রকৃতি সে প্রেমের প্রধান পটভূমিকা ।

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি এবং তার সৌন্দর্য কাব্যবিষয় হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে । সংস্কৃত সাহিত্যে নিছক প্রকৃতির স্থান নেই ; মানুষের আনন্দ-বেদনার পটভূমিকারূপেই সেখানে প্রকৃতি এসেছে । ইউরোপীয় রোমান্টিক কবিদের হাতে প্রথম প্রকৃতি একটি পৃথক্ সত্তা লাভ করে সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছিল । সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের হৃদয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সখী বা মাতৃরূপে প্রকৃতি মানুষের পরিচর্যা করেছে, তবু মানুষ ছাড়া শুধু প্রকৃতির নিরপেক্ষ-সৌন্দর্য প্রাচীন কবিদের হাতে ধরা পড়ে নি । ক্লাসিকেল দৃষ্টির অধিকারী মধুসূদনও প্রকৃতির উপর মানবীয় ভাব আরোপ করে এবং মানবহৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেই প্রকৃতিকে দেখেছেন, তার পৃথক্ অস্তিত্ব নেই । ব্রজাঙ্গনাতে বিরহখিন্না রাধা প্রকৃতির) করেছে — ইন্দ্রজিতের প্রত্যাবর্তনের বিলম্বে প্রমীলা যেভাবে প্রকৃতির মধ্যেও মনোভাবকে প্রকাশিত

---

৩৫. ৭০নং পত্র

দেখেছিল, সেরকমই। প্রকৃতি রাধার প্রেম-ভাব প্রকাশের উপকরণ-মাত্র হয়ে রয়েছে — মূর্ত হয়ে উঠতে পারে নি; তেমনি মানব জীবনের পটভূমিকা হিসাবেও এ কাব্যে প্রকৃতি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। প্রকৃতির সঙ্গে এখানে রাধার অন্তরঙ্গ সম্পর্কও স্থাপিত হয় নি। বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক বস্তুর উল্লেখে তার ভাবরূপটির পরিচয় মেলে না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যেও যে নিখিল - সৌন্দর্যের স্পর্শ ও অনুভূতিকে রসময়ে আবিষ্কার করেছিলেন, তেমন রোমান্টিক কল্পনার অধিকারী না হলেও তিলোত্তমাতে মধুসূদনের একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য-চেতনা ধরা পড়েছিল, তেমন কোন মায়ময়িক দৃষ্টির পরিচয় ব্রজাঙ্গনায় নেই। তাঁর [illegible] ফলে সব বর্ণনাই প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ব্রজাঙ্গনাতে প্রকৃতিকে মানব-সম্পর্কান্বিত করে দেখার সঙ্গে অনেক সময়ই মানবধর্ম আরোপ করে প্রমূর্ত সমাসোক্তি (personification)-এর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভাবরসের দ্যোতনার অভাবে তা নিতান্ত প্রাণহীন প্রথাবদ্ধ আলংকারিকতাতেই পর্যবসিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে মানুষের আনন্দ বেদনার পটভূমিকা হয়েও প্রকৃতির একটি জীবন্ত সত্তা অনুভব করা যায়, কিন্তু মধুসূদনের বর্ষা-বসন্ত বর্ণনা নিতান্তই প্রাণহীন।

প্রেমের কবিতা রচনায় মধুসূদনের কৃতিত্বের পরিচয় তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে, সীতা-প্রমীলার চরিত্রে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে একটি কাহিনীর আশ্রয়ে চরিত্রগুলি ফুটেছে। রাধার তেমন কাহিনী নেই, ক্রমবিকাশমান চরিত্রও নয় তার, নির্বিশেষ প্রেমানুভূতির বেদনাই সে চরিত্রের একমাত্র পরিচয়। অন্য নায়িকাদের যে দেহজীবনের ভোগবাসনা তাদের সদা চঞ্চল করেছে, বৈষ্ণব ধর্মের পরকীয়া প্রেমের তত্ত্বের প্রতীক রাধাকে সিন্দুর-বিন্দু-শোভিতা Mrs. Radha-তে পরিণত করে তাকেও সেরকম মিলন-সুখ-পিপাসু করে তোলায় যে বিলাসিনী নায়িকার রূপ ফুটেছে তা নিতান্ত বিসদৃশ। রাধা তো একটি ভাব মাত্র, তাকে মধুসূদন রক্ত-মাংসের মানুষ করে তুললেন অথচ তাকে চিরবিরহিনী করে রেখে স্থাপন করলেন, এখানেই এ কাব্যের রসাভাসের কারণ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কবির ভাবের সঙ্গে প্রাণের সাযুজ্য ঘটেনি বলে শিল্পের ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা এসেছে অনিবার্যভাবে। অযথা অলংকরণ ও বাগাড়ম্বর রচনাকে করেছে পীড়িত।

পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ রাধার পক্ষে নিতান্ত বেমানান। সে তো বিদগ্ধ নাগরী নয়, মুগ্ধ গোপবালিকা। অনুশীলন ও পরীক্ষণের ঝোঁকে মধুসূদন সে কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তিলোত্তমা-মেঘনাদ-কৃষ্ণকুমারীর সংঘাত সংকুল ঘটনা এবং ভাষার উচ্চাবচ উদাত্তগম্ভীর রূপ সৃষ্টির সমকালেই[৩৬] যে কবি মৃদু স্নিগ্ধরস এই কাব্যটি রচনা করলেন, তার এক কারণ যেমন হতে পারে নাটকের [illegible] এর মত চিত্ত-বিশ্রামের অবকাশ-বাসনা, অন্যদিকে বিদ্যাপতি জয়দেবের ললিত কাব্যপাঠ ও সঙ্গীতসুধা শোনার অভ্যাস এবং সাধারণভাবে বাঙালীর ব্রজকাহিনীর প্রতি আকর্ষণও তার কারণ হতে পারে। মেঘনাদবধ কাব্যেও যে তিনি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্রজকাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা ভোলা যায় না। এ ছাড়া ছন্দ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার আকর্ষণও ছিল।

পয়ার পংক্তির পর্বগুলিতে মাত্রাপর্যায়ী রীতিতে মিশ্ররীতি ও চতুর্মাত্রকতা বজায় রেখেই যেমন অমিত্রাক্ষরের প্রবহমানতাকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করলেন মধুসূদন, তেমনি পয়ার ত্রিপদীতে ব্যবহৃত সেই চতুর্মাত্রপর্বিক মিশ্রকলামাত্রিক ছন্দকে অবলম্বন করেই তিনি বিচিত্র আয়তনের নাতিদীর্ঘ পংক্তি সাজিয়ে স্তবক রচনার খেলার দিকেও মন দিয়েছেন ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। এ কাব্যকে কবি নিজে Odes নামে চিহ্নিত করেছেন।—

> "The Odes are now in the hand of the printer[৩৭]
>
> The 'odes' are cut ... a volume of Odes.[৩৮]

---

৩৬. মেঘনাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পরে যদিও ব্রজাঙ্গনা প্রকাশিত হয়, তবু এটি আগে রচিত হয়েছিল। দ্র. জীবনচরিত, পৃ. ৩৩২, ফুটনোট এবং ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. বাঁইত্রিশ।

৩৭. ৭০নং পত্র

৩৮. ৬৭নং পত্র

তিনি ইচ্ছা করেই এ নাম ব্যবহার করেছেন মনে হয়। ওড-এর বিশিষ্ট লক্ষণ হ'ল — কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে লক্ষ্য করে কবিতাটি বলা হয় এবং অনেকটা আত্মপ্রকাশের সুযোগও থাকে তাতে। জটিল ও বিচিত্র ধরণের স্তবকসজ্জা, বিভিন্ন আকৃতির পংক্তি এবং মিলের জটিলতাও এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি ওড লিরিক শ্রেণীর কবিতা, এতে কবির ব্যক্তিগত আশা বেদনা ও স্বদেশচেতনার প্রকাশ থাকে। কাহিনীনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ রচনায় কৃতিত্ব অর্জনের পরেও কবির মনে হয়েছে যে তাঁর মধ্যে রোমাণ্টিক ধরণের লিরিক রচনায় শক্তি আছে।

But there is the wild field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the lyric way.[৩১]

গেয় হলেই যদি গীতিকবিতা হয় তবে বৈষ্ণব কবিতাকে ঐ নামে অভিহিত করা চলে। এর কাহিনী বা চরিত্রের বিবর্তন ব্যতিরিক্ত নিবিড় অনুভূতির আবেগোচ্ছ্বাসের ধারক বলেও এক অর্থে তা গীতিকবিতা। কিন্তু লেখকের আত্মময়তাই যদি গীতিকবিতার লক্ষণ হয় তবে কখনই বৈষ্ণব পদ তা নয়। একই কারণে ব্রজাঙ্গনাও তা নয়। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' বা 'রেখো মা দাসেরে মনে' খাঁটি গীতিকবিতার লক্ষণযুক্ত। ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত মধুসূদন ব্রজাঙ্গনাকেও lyric মনে করেছেন, সেটা আশ্চর্যই মনে হয়। এই কবিতাগুলিতে ওড-এর অন্য লক্ষণ বর্তমান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সখী বা কোন নিসর্গবস্তুকে উদ্দেশ্য করে রাধার বয়ানে কবিতাগুলি রচিত; সখীসম্বোধনেও এই লক্ষণ দেখা যায়। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু রাধার সহৃদয়ে পরিণত। স্তবক নির্মাণের বিচিত্রতা এবং জটিলতা, মিলের রকমফের — কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে। আমাদের সেটি উদ্দিষ্ট না হলেও এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারি যে, দেশীয় ভাবকে নিয়েই তিনি বিদেশী একটি কাব্যরীতিতে আরোপিত করলেন। প্রাচীন গ্রীক নাটকে ব্যবহৃত কোরাসগুলিই ওডের আদি নিদর্শন, পরে নানা কবির হাতে পরিবর্তিত হতে হতে উনবিংশ শতকের ইংরেজ কবিদের হাতে এসে তা লিরিক-লক্ষণ অর্জন করল, তবু তার মূল কতকগুলি

৩১। ৫৭নং পত্র

গঠনবৈশিষ্ট্য থেকেই পেল । মধুসূদন যে সেই বৃত্তবন্ধকে বাংলাসাহিত্যে নিয়ে এলেন তাতে তাঁর সেই 'কাব্যকলাকুতূহল'-এরই পরিচয় ।

মিত্রাক্ষরের পংক্তি-স্তবক সৃষ্টিতে ভাব ও সংগীতের সার্থক শিল্পগত সাযুজ্য স্থাপনের পরেও কিন্তু মিত্রাক্ষর রচনায় প্রভুত্ব তাঁর প্রতিষ্ঠিত হয় নি — এটি লক্ষণীয় । অবশ্য চিরাগত পয়ার ত্রিপদীর একঘেয়েমি নয়, মিলের বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্ব সাধন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল ।

I have made up my mind to write (Deo volente !) three short poems in Blank-verse and then do something in Rhyme I don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Ottava Rima and write a romantic tale in it.[৪০]

If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the Ottava Rima or stanzas of eight lines like his (Tasso). Perhaps I shall write your সিংহলবিজয় in that measure.[৪১]

এই রীতির স্তবকে থাকে এগারোটি দল সমন্বিত আটটি পংক্তি, তার মিলের পদ্ধতি — কখ কখ কখ গ গ । ইতালিতে উদ্ভাবিত এবং ট্যাসো ব্যবহৃত এই স্তবকবিন্যাস ইংরেজি সাহিত্যেও বহু ব্যবহৃত । প্রসঙ্গত বলা চলে সনেটও এক শ্রেণীর মিত্রাক্ষর স্তবক বিন্যাস — তার প্রথম স্তবকটির প্রকৃতি এই Ottava Rima -র ধরণেরই, যদিও Ottava Rima দীর্ঘ কবিতাতে ব্যবহৃত হয়, আর সনেট ক্ষুদ্র সম্পূর্ণ । সনেটের বিশিষ্ট্য লক্ষণ তার দৃঢ়পিনদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস-সংযতা । এই বৈশিষ্ট্য রক্ষায় মধুসূদন সর্বথা সফল না হলেও এই কাব্যবন্ধটির গঠন বিষয়ে কঠিন শাসন ও মিলের বিচিত্রতাই মধুসূদনকে আকৃষ্ট করেছিল —

---

৪০. ৫১নং পত্র

৪১. ৬৪নং পত্র

মনে করা অন্যায় নয়। বিরাট গম্ভীর বীর্য কাহিনী যখন তিনি অনুসন্ধান করছিলেন তখন রাজনারায়ণ তাঁকে সিংহল বিজয়ের কাহিনী দিয়েছিলেন। সেই কাহিনীর সার্থক রূপায়ন Ottava Rima – তে হতে পারে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল; তাতে মনে হয় উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে মিত্রাক্ষরেরও যে শক্তি কম নয়, সে বিশ্বাস তাঁর ছিল। দেশীয় সাহিত্যে এই মিলের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ছন্দে মিলের স্থান নেই; আর বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে যেমন নিস্তরঙ্গ ধ্বনি ও মিলের একঘেয়েমি, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে তাদের বিন্যাস ও সংকুচিত করবারও প্রয়াস নেই। তাই পশ্চিম থেকেই তাঁকে এই গঠন কৌশলটি আমদানি করতে হয়েছে।

অথচ তাঁকেই আবার বলতে দেখি — By the bye রাধার বিরহ is in the press. Some how or other, I feel backward to publish it. What have I to do with Rhyme.৪২ এ তাঁর সেই চিত্তের অস্থির চিন্তা ও অতৃপ্তিরই প্রকাশ।

বীরাঙ্গনা (প্রকাশিত ১৬ জানু, ১৮৬২) কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থকতম ব্যবহার। কাহিনী সবই পুরাণ থেকে নেওয়া আর কাহিনী নির্ভর চরিত্রচিত্রণে আনুপূর্বিক সম্পূর্ণ গোপন রেখে একান্ত মানবীয় অনুভবে চিত্রিত নারীচরিত্রের সার্থক ও সজীব রূপায়নই এ কাব্যের বিশিষ্টতা। ওভিদের Heroic epistles এর অনুকরণে পত্রিকাসাহিত্য বাংলায় অভিনব সংযোজন। সমকালীন যুগচেতনা পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে কতখানি পরিবর্তিত করেছে সে বিচার বর্তমান প্রসঙ্গে গৌণ।

মধুসূদনের কবিব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিল এক অতৃপ্তি ও দ্বিধা। কাহিনী ও চরিত্র নির্ভর তন্ময় (objective) সাহিত্য সৃষ্টিতে যখন চরম সাফল্যে পৌঁছেছেন তখন মনে হয়েছে তাঁর মনের রোমান্টিক গীতি প্রবণতাই বুঝি বড়। তেমনি যখন তাঁর সাহিত্যখ্যাতি এবং সমাদর উচ্চতম শিখরে, তাঁর বইয়ের সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে, তখনই আইন পড়ে অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে পাড়ি দিলেন।

---

৪২. ৬১নং পত্র।

আবার বিলাত যাবার সুচিরলালিত আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ, মর্ত্যে অমরাবতীতুল্য ফরাসী দেশের ভের্সাইয়ে যখন তিনি বিমুগ্ধ, সে সময়ে বাগেরহাট থেকে লেখা গৌরদাসের পত্র পেয়ে সে স্থানের অদূরে সাগরদাঁড়ী ও কপোতাক্ষনদের কথা স্মরণ করে তাঁর মন বিষণ্ণ বেদনাতুর হয়ে ওঠে। যখন ফরাসী ইটালীয় এবং জার্মান ভাষাকে আয়ত্ত করে ফেলেছেন, তখনই বাংলা ভাষার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ বিশেষভাবে অনুভব করেন।

If there be anyone among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere -- his proper element. European scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our own language.[৪৩] বেথুন সাহেবের উপদেশ নিজের অন্তর উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত।

এই অস্থিরতাই তাঁকে গীতিকবিতা এবং বিস্ময়ের দিকে প্রণোদিত করেছে, আবার — Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and sonnets for the rest of my days ? The idea is intolerable.[৪৪]

এই অতৃপ্তি তাঁকে বিশেষ এক রকমের সৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য সহকারে যুক্ত থাকতে দেয় নি। সনেট নিয়ে তাঁর পরীক্ষা আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। যখন মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গ লিখছেন তখনই প্রথম সনেট 'কবি মাতৃভাষা' লিখেছেন, এ বিষয়ে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছেন — **I introduce the sonnet into our language.**[৪৫] অবশ্য বিদেশ যাবার আগে আর সনেট রচনা করেন নি। এ শ্রেণীর কবিতা রচনার দিকেও পশ্চিমের সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে নূতন কিছু আমদানি করার ইচ্ছাটাই হয় তো

---

৪৩. ১১২নং পত্র

৪৪. ৭৩নং পত্র

৪৫. ৬৪নং পত্র

প্রবল ছিল। তবে ইটালীয় সনেট যে বাংলাতেও সফল হবে – সে বিশ্বাস তাঁর ছিল। In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.[৪৬] কিন্তু বিদেশে গিয়ে যখন তিনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করলেন, তখন তাঁর কাব্যপ্রেরণা অবমিত-প্রায়, শুধু প্রাণধারণের সংগ্রামে তাঁর কবিশক্তি কুণ্ঠিত।

I have not been doing much in the poetical line, of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back. You know I write by fits and starts.[৪৭] মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ লেখার সময়েও এই fits-এর কথাই বলেছিলেন, কিন্তু কত অন্যভাবে।

I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs! but I have fits of enthusiasm that come on me occasionally, and then I go like the mountain torrent![৪৮] এই সর্বপ্লাবী আবেগ যে লুপ্ত হয়ে আসছিল তাও অনবহিত ছিল না –

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse![৪৯] এক সর্বাত্মক ক্লান্তি তাঁকে গ্রাস করল, যিনি এক কালে বলেছিলেন I shall come out like a tremendous comet and no mistake,[৫০] উল্কার মতই বড় তাড়াতাড়ি তাঁর প্রতিভাদীপ্তি নির্বাপিত হয়ে গেল।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে সর্বত্র মধুসূদনের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ না থাকলেও বাংলাসাহিত্যে একটি বিশেষ রীতির কবিতা প্রবর্তিত করবার কৃতিত্ব ছাড়াও কতকগুলি

---

৪৬. ঐ
৪৭. ১০৪নং পত্র
৪৮. ৫১নং পত্র
৪৯. ৭৪নং পত্র
৫০. ৭০নং পত্র

সনেটে তাঁর কবিত্বশক্তি অথবা হৃদয় ভাবোদ্বেলতার পরিচয় পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি নিজে এই ১০২টি কবিতার পুস্তকে[৫১] চতুর্দশপদী কবিতাবলী নামে অভিহিত করলেও চোদ্দ পংক্তি বা লাইন (এই অর্থেই 'পদ' ব্যবহৃত) হওয়াই এর একতম লক্ষণ নয়। A Sonnet is a moment's monument. একটি বিশেষ ঘটনা বা ভাবকে চোদ্দ পংক্তির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে, সংগীত প্রবাহের মাধ্যমে গাম্ভীর্য ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। একটি নিটোল ভাবানুভূতি সুগভীর আবেগে বিধৃত হয় বলে সনেট গীতিকবিতা শ্রেণীর; অথচ এর গঠনে শিথিলতার অবকাশ নেই — এর কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। সেই নিয়মের শাসনে ভাবটি উচ্ছ্বাসের তারল্য বর্জিত হয়ে পাত্রবদ্ধ সংহত মহিমা অর্জন করে। তাই সনেট প্রকৃত অর্থে লিরিক হয়েও বহিরঙ্গে ক্লাসিকেল গঠনরীতির অধীন। এই বিশিষ্ট লক্ষণের জন্যে মধুসূদনের কবিমানসের পক্ষে সনেটের রূপকল্পটি উপযোগী হবারই কথা। ইটালীয় সনেটের অনুকরণে তিনি সনেট লিখছেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। সে দেশের কবি পেত্রার্কাই সনেটের জনক বলে স্বীকৃত। পেত্রার্কীয় সনেটের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ আছে। অষ্টক (Octave) ও ষট্‌ক (Sestet) — বিভক্ত চতুর্দশ পংক্তির প্রথম অংশে ভাবটি উপস্থাপনা ও সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয় অংশে তাকে গুটিয়ে এনে একটি পরিসমাপ্তি। অষ্টক ও ষট্‌কের এই আবর্তন সন্ধিটি তাঁর সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথমাংশের মিল বিন্যাসের পর্যায় কখখক কখখক; কখনও বা বিবৃত অষ্টকের মিল বিন্যাস কখকখ কখকখ। অষ্টকটি আসলে দুটি চতুষ্কের সমাহার। ষট্‌কে দুটি ত্রিক, তাতে মিলেরও কিছু বৈচিত্র্যের অবকাশ আছে। তার পর্যায় হয় গঘঙ গঘঙ অথবা গঘ গঘ গঘ, অথবা অন্য কিছু, তবে মিল দুটি অথবা তিনটি এবং কবিতায় মোট মিল পাঁচটির বেশি নয়। মিলটনের সনেটে মিলের রীতি মোটামুটি পেত্রার্কার মত, তবে ষট্‌কের মিল পদ্ধতিতে তিনি কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। কিন্তু মিলটন ভাবের দিকে অষ্টক ষট্‌কের ভাগ মানেন নি বলে ভাবটির সমুদ্রের ঢেউয়ের মত প্রবল বেগে আছড়ে পড়ে তার পরে পশ্চাদপসরণের ভঙ্গিটি তেমন আসে নি, সমগ্র কবিতায় একটি একাগ্র সংগীতময়তা

---

৫১. তাঁর জীবিত কালে ১৭ মার্চ, ১৮৬৬ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে ১০২টি কবিতাই ছিল; অন্য আরও কয়েকটি সনেট পাওয়া যায়, সব মিলে ১১০টি সনেট আছে।

প্রকাশিত হয়েছে। সেক্সপীয়রের সনেট কিছু শিথিলগ্রথিত, তাতে আবর্তন সম্ভিত নেই। তিনটি চারপংক্তির স্তবকের মধ্যে ভাবের ঊর্ধ্বারোহণের পরে শেষ দুটি মিল পংক্তিতে একটি আকস্মিক চমক সৃষ্টি হয়। ফরাসী সনেটে গঠন অনেকটা পেত্রার্কার সনেটের মত, আবর্তন সম্ভিত থাকে, ষটকের প্রথম দুই পংক্তিতে মিল স্থাপন করেও ষট্‌কটিকে দুটি ত্রিকে ভাগ করা হয়। আর ফরাসী সনেটে আবেগ-নিবিড়তার চেয়ে শেষে এক বুদ্ধিদীপ্ত চমক সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। সনেটের স্তবক বিন্যাস অথবা মিল বিন্যাসে কিছু পার্থক্য কবি-বিশেষের হাতে রূপ সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাত্র; চোদ্দপংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ কবিমনের একটি মাত্র ভাব কঠিন শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ও সংহত হয়ে বিশিষ্ট রসের সৃষ্টি করে — সেটিই তার প্রধানতম লক্ষণ। উল্লেখ করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সনেটে কঠিন নিয়ম মেনে চলেন নি, তবু নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে ভাষা ও ছন্দের মাধ্যমে বিষয়কে অতিক্রম করে এক অলৌকিক রসলোক সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

মধুসূদন বাংলায় এই যে নূতন রচনাভঙ্গিটি নিয়ে এলেন তা গীতিকবিতা শ্রেণীর এবং তা [redacted] মিত্রাক্ষর রীতির। ছন্দের দিক ফরাসী সনেটে প্রতি পংক্তিতে বারটি দল এবং ইংরেজি সনেটে দশটি দল থাকে। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের মতই মিশ্র-কলামাত্রক রীতির চোদ্দমাত্রার পংক্তিকে এই শ্রেণীর কবিতাতেও ব্যবহার করেছেন; পরবর্তী কালেও এই রীতিই প্রধানতঃ অনুসৃত হয়েছে। মিলের বিচিত্র পর্যায় সৃষ্টি করে এই সনেটগুলির কঠিন বন্ধনের মধ্যেও সংগীত ঝংকার দিয়ে অন্তর অবকাশটিকে তিনি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। যখন দীর্ঘ কাহিনী রচনার মত ধৈর্য বা অবকাশ আর নেই, — হয় তো বা শক্তিও, — তখন খণ্ডকবিতার মধ্যে নিজের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা, কোন বাল্যস্মৃতি অথবা সাহিত্যলোক থেকে উঠে আসা কোন চিত্রকে ধরে রাখবার বাসনায় একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কল্পনাশ্রিত এই রূপবন্ধটিকেই হয় তো তাঁর উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। তাঁর সনেটগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি প্রধানতঃ পেত্রার্কান সনেটের মিল বিন্যাস-কেই অনুসরণ করেছেন, তবে কিছু শিথিলতা বা বৈচিত্র্যও তাঁর মিলবিন্যাসে ধরা

পড়ে । তবে পেত্রার্কান সনেটের যেটি প্রধান বিশিষ্টতা, সেই অষ্টক ষট্‌কের আবর্তন সন্ধি সর্বত্র রক্ষিত হয় নি । প্রথম আট পংক্তির পরে ভাবের পূর্ণচ্ছেদ স্থাপন করে নূতন কোণ থেকে তা উপস্থাপিত করে সমুদ্রতরঙ্গের জোয়ারভাটার ভঙ্গিটি আনতে তিনি সর্বত্র সক্ষম হন নি, তাই তাঁর সনেটকে মিলটনীয় সনেট বলা ফ্লান । তিনি নিজে যদিও ফরাসী সনেটেরও উল্লেখ করেছেন, তবু বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে চমক সৃষ্টি তাঁর কবিত্বের ধর্ম নয় ।

মধুসূদনের সনেটের বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । এদিক দিয়ে তিনি পেত্রার্কাকে অনুসরণ করেন নি । পেত্রার্কার প্রায় সব সনেটই প্রেম বিষয়ক । জগৎ ও জীবনের নানা বিষয় নিয়ে মধুসূদনের সনেটগুলি রচিত । মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির জন্য সুদূর প্রবাসীর ব্যাকুলতা যেমন আছে অনেকগুলি কবিতায়, তেমনি আছে প্রাচীন সাহিত্যের ও কবির প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় । দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে, নিসর্গ নিয়ে, নানা তত্ত্ব বা নীতি নিয়েও আছে অনেকগুলি কবিতা । মাত্র দু'তিনটিতে পাই ব্যক্তিগত প্রেমের বেদনার আভাস । সবগুলি সনেট যে কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট তা নয়, তবু ব্যক্তি মনের উষ্ণস্পর্শে অথবা বেদনাবিধুর দীর্ঘশ্বাসে অনেকগুলি সনেটই হৃদয়স্পর্শী হয়েছে । ব্যক্তি মধুসূদনকে জানতে হলে, তাঁর অনাবৃত হৃদয়স্পন্দন পেতে হলে, চতুর্দশপদী কবিতাতেই খুঁজতে হবে । মেঘনাদবধ কাব্যের মহৎ আবরণের মধ্যে যদিও তাঁর নিজের জীবনেরই প্রতিফলন, তবু পৌরাণিক চরিত্রের আড়ালে তাঁর ভাবজীবন ব্যঞ্জিত; সহজ সরল ভাবে একান্ত নিজের মনের কথাটি বলার অবকাশ মহাকাব্যে নেই । যে কটি কবিতায় নিজস্ব সুখ-দুঃখ-আশা ও রুচিকে তুলে ধরেছেন, সনেট হিসাবে সেগুলি সার্থক । চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেখানে আত্মকথা কঠিন ও সংহত হয়ে ধরা পড়েছে । আর যে কবিতাগুলি একটি বিশিষ্ট রূপকল্পের আধারে বিধৃত অথবা একটি মৌহূর্তিক সৌন্দর্যের ধারক, সেগুলিও পাঠকমনে একটি স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম । কিন্তু কতক ক্ষেত্রে তিনি আবেগহীন বর্ণনার ভঙ্গি আশ্রয় করেছেন অথবা নিছক কাহিনী উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে একটি সনেটে পরিসমাপ্ত না হয়ে পরবর্তী সনেটে প্রবাহিত হয়েছে; সেখানে সনেট গীতিকবিতার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে । তবু মনে রাখতে

হবে , তাঁর অন্যান্য কাব্য যতই গুণ-সমৃদ্ধ হোক্ , দীর্ঘকাল সেগুলি অনুসৃত হয় নি । বাংলা ভাষায় সনেটের যে সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনা তিনি অনুমান করেছিলেন তা সফল হয়েছে — এই কলাকৃতি আজও মর্যাদা লাভ করে চলেছে । তাঁর সনেট সম্পর্কে শ্রীযুক্ত-সুকুমার সেনের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য গুলি সম্পর্কে কারোরই দ্বিমত থাকার কথা নয় —

"সনেটেই নবীন বাঙ্গালা কবিতায় মধুসূদনের মহত্তম গুণ সৃষ্টি ।... দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার রেশ চতুর্দশ পদী কবিতাবলীর মধ্যে ঘনীভূত ।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা যেহেতু এই কবিতা-গুলিতে কবির আত্মপ্রকাশ সবচেয়ে স্ফুট ।[৫২]

---

৫২. সুকুমার সেন , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ , পৃ. ১৬২